যথেষ্ট বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু দরিদ্র কাঙ্গালদের ক্ষুধার অন্ন, পিপাসায় জল, রোগের ঔষধ এবং কর্ম্মহীনদিগকে কর্ম্ম দিয়া তিনি যে অমানুষী আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, এ জগতে তাহার তুলনা নাই। ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জলও অনেকে দিতে পারেন, কিন্তু এরূপ পাপী নারকীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এ জগতে বোধ হয় আর কেহ কখনও ধারাবাহিকরূপে চেষ্টা করেন নাই। অত্যাচার, গালাগালি, তিরস্কার চতুর্দ্দিক হইতে বর্ষিত হইতেছে;—তরঙ্গাভিঘাতে প্রেম-জাহাজ যায় যায় হইতেছে, কিন্তু তিনি নির্ভীক ও অবিচলিত। ক্ষীণদেহে এত তেজ? দুর্ব্বল শরীরে এত শক্তি কোথা হইতে আসিল? বলিবে না কি যে, উহা বিধাতার প্রকট প্রেম-মূর্ত্তি। শুধু প্রেমেই তিনি সবল, দুর্দ্ধর্ষ ও অজেয় ছিলেন। কোটী কোটী পাপী তাঁহার প্রেমে রক্ষা পাইয়াছে।

নিন্দা ব্যবসা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সংসারের কৃমীকীট, মনুষ্যের মহত্ত্ব দেখিতে পাও না? মহত্ত্ব দেখিলেও তাহা স্বীকারে কুণ্ঠিত হও? দেখিয়া, ভাবিয়া, শুনিয়া স্তম্ভিত হও,—এ পৃথিবীতে এমন একজন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি নরদেহে দেবতা ছিলেন। তিনি অসুরকুলে ভক্ত প্রহ্লাদ ছিলেন। অথবা রাখিয়া ছাটিয়াই বা বলি কেন, তিনি ছিলেন নরহরি। তাঁহার তিরোধানে ইংলণ্ড আজ মানব-দেবতা-হীন হইল। শত ষ্টেড্, হিউম ও ভবসীর তিরোধানে যাহা হইতে পারে না, তাহা হইল! তাঁহার ধ্যানে, তাঁহার চিন্তনে আমরা কবে দেবত্বে উন্নীত হইব?

জগৎ আজ দারুণ শোকে আচ্ছন্ন। চতুর্দ্দিকে রাজা প্রজা এক বাক্যে তাঁহার যশোকীর্ত্তন করিতেছেন। চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারে জমিতেছে, কিন্তু এ সকল তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার নয়। তাঁহার পুরস্কার মানবের দ্বিজত্বে, তাঁহার পুরস্কার সাম্যে, তাঁহার একমাত্র পুরস্কার দরিদ্র কাঙ্গালদের সেবায় এবং উদ্ধারে। যখন পৃথিবী হইতে উচ্চনীচ ভেদ চলিয়া যাইবে, শোণিতপাত বা যুদ্ধ বিগ্রহ উঠিয়া যাইবে, মানুষ পতিত পাপী নারকীকে আদর করিতে শিখিবে, তখনই তাঁহার উপযুক্ত পুরস্কার মিলিবে। কিন্তু তাহা কখনও জড়-ভাবাপন্ন পৃথিবীতে হইবে কি?

---

# বঙ্গসাহিত্য।

আজকাল ভাষাতত্ত্ব লইয়া যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষার জন্ম-কোষ্ঠী এইবার প্রস্তুত হইবে। বঙ্গভাষা ভারতীয় প্রচলিত ভাষাগুলির অন্যতম। এই ভাষা কতদিনের, তাহার কোন প্রকার প্রামাণিক ইতিবৃত্ত ভালরূপ পাওয়া

---

Booth was fond of telling the story of a little schoolboy, who had to endure the chaff of his schoolfellows, and even of his teacher, for his Salvationist parentage "You're a Salvationist?" asked the teacher one day "Yes sir" "And you have an Lord's Supper" "No sir" "Then "What have you?" The boy thought for a new moments, and answered, "Farthing breakfasts for the poor"

* * * *

With the passing of William Booth the Salvation Army will have a new interest, for despite the loyal assistance of his colleagues, everybody who came into contact with the man and the movement realised that the Salvation Army was William Booth and that William Booth was the Salvation Army"—THE STATESMAN.

যায় না। ফাহিয়ান্ (৩৯৯-৪১৪) নামক জনৈক চীন পরিব্রাজক ৪০০ খ্রীঃ সমুদ্র গুপ্তের রাজত্ব কালে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন "এতদ্দেশে মাগধীভাষা প্রচলিত ছিল।" শিপ্রাতট-শোভিনী মালব-দেশস্থ উজ্জয়িনীপতি বিদ্যার উৎসাহ-দাতা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজত্ব কালে (৫০০-৫৫০) এক প্রকার সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশে প্রাকৃত, মাগধী, মহারাষ্ট্রীয়,সেবিসেনী, পৈশাচী প্রভৃতি কতিপয় ভাষা প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা ভাষা ঐ প্রাকৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রেও বঙ্গাক্ষরের বিবরণ পাওয়া যায়; ইহাতে বোধ হয় যে, তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারিত হইবার সময়ে ইহা প্রচলিত ছিল। ফলতঃ নরহরি দাস, কৃষ্ণদাস, বসন্ত রায়, জীব-গোস্বামী, রায় শেখর * * * * প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের রচনা পাঠে প্রতীত হয় যে, বঙ্গদেশে প্রথমতঃ এক প্রকার হিন্দীভাষা প্রচলিত ছিল। প্রাকৃত ও হিন্দীতে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ হিন্দী-ভাষাও মাগধীর অপভ্রংশ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। কেহ কেহ বলেন, রূপ ও সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর রচনা বঙ্গভাষার সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ। আবার কেহ কেহ বলেন, ত্রিপুরার রাজাবলী আরও প্রাচীন।

ভারতাকাশে চৈতন্যচন্দ্রের (১৪৮৫-১৫৩৩) উদয় হইবার পূর্ব্বে চণ্ডীদাস (১৪১৭-১৪৭৭) ও বিদ্যাপতি (১৪৩৬-১৪৮১) অনেক বাঙ্গালা রচনা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেবের সময় হইতেই কিন্তু বাঙ্গালাভাষার যুগান্তর উপস্থিত। তাঁহার অনেক শিষ্য পদাবলী রচনা করিয়া বঙ্গভাষাকে উন্নতিশীল করিয়া যান। ইহার অব্যবহিত পর হইতে ক্রমান্বয়ে কবিগুরু বাল্মীকি প্রণীত কৃত্তিবাসের রামায়ণ, রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্ত্তন, মুকুন্দ-রামের চণ্ডী, ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসের মনসার ভাসান, রামপ্রসাদের পদাবলী, কাশী-রামের মহাভারত, প্রাণরামের কালিকা-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত হয়।

প্রাচীন কালে বঙ্গভাষার রচনা প্রণালীর কোন প্রকার নিয়ম নিবদ্ধ ছিল না। ইহার বহু কাল পরে ব্যাকরণের নিয়ম ও পদ-রচনার রীতি প্রচলিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীঃ হাল্‌হেড সাহেব প্রথমে বঙ্গভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ইহাই বঙ্গভাষার সর্ব্ব প্রথম ব্যাকরণ। ১৮০০ খ্রীঃ এদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্টউইলিয়ম্ কলেজ স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ে ব্যবহারের জন্য একখানি বাঙ্গালা পুস্তকও প্রচারিত হয়। মার্সমান্, ওয়ার্ড ও কেরী প্রভৃতি পাদরীগণ এই সময়ে হুগলী শ্রীরামপুরে একটী বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহার পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করেন।

বঙ্গভাষার আদ্যকালে নবোত্তম দাস, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, রামচন্দ্র দাস, গোবিন্দ দাস, * * * প্রভৃতি দ্বারায় বাঙ্গালা ভাষার অনেক পুষ্টিসাধন হইয়াছে। ইহার মধ্যকালে ভারতচন্দ্র রায়, হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী, রামনিধি গুপ্ত, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, রাম বসু, * * * প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজ সংস্কার উদ্দেশে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তৎকালে হিন্দু-সমাজ মধ্যে গভীর আন্দোলন উপস্থিত হয়। বাঙ্গালা গদ্য রচনা এই আন্দোলনের ফল-স্বরূপ। তিনিই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালা গদ্য রচনার প্রবর্ত্তক। এই সময় দাশরথি রায়,

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, * * * প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার পর ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক মানব-প্রেমিক প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গমাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট বহু পরিমাণে ঋণী। এক সময়ে সুপ্রসিদ্ধ কর্ম্মবীর অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনী চালিত হয়। তাঁহারা উভয়ে অদম্য উৎসাহের সহিত স্বজাতীয় ভাষাকে যে স্থানে যে সারপদার্থ পাইয়াছেন, যে উদ্যানে যে সকল কমলকান্তি সুগন্ধি পুষ্পরাজি দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা অতিযত্নে সংগ্রহ করিয়া মনোমোহিনী মালা রচনা দ্বারা অঞ্জলী প্রদান করিয়াছেন। এই সময় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, দীনবন্ধু মিত্র, ব্রজগতি ন্যায়রত্ন, রামদাস সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গভাষার বহুবিধ উৎকর্ষ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভারত সাহিত্যোদ্যানে বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিকশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী চিত্রকর যে সাহিত্যকে নানা বর্ণরাজিতে ভূষিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই গৌরবের সামগ্রী। কবিকুলভূষণ মাইকেল মধুসূদন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রথিত কবিতামালা প্রদান করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তিলাভ করিয়া গিয়াছেন। ফলতঃ ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত—ইঁহারা বাঙ্গালার প্রতিভা ক্ষেত্রে পাঁচটী মহাসাগর। বঙ্গভাষায় ইদানীন্তন কালে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ বঙ্গসাহিত্য-সংসারে পরিচিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অক্ষয়চন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, শিবনাথ, ইন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধনে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতেছেন।* সংস্কৃত বঙ্গভাষার পূজনীয়া ধাত্রী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সংস্কৃত ভাষাই বাঙ্গালা ভাষার জননী—সংস্কৃত ব্যাকরণই বাঙ্গালা ব্যাকরণের জনক। সেই জন্যই মনে হয়, এই সংস্কৃত ভাষা বহুকাল হইতে গ্রন্থগত হইয়া, কল্পতরুর ন্যায় সমুন্নত শিরে সকল ভাষার পূজ্য হইয়া অবস্থান করিতেছেন। আর বাঙ্গালা ভাষা সেই কল্পতরুতলে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক সাধ্য ও আবশ্যক মত পত্র-পুষ্প-ফল আহরণ করিয়া নিজ অঙ্গ পুষ্ট করিতেছে মাত্র। ইংরাজী ভাষার নিকট বঙ্গভাষা বিশেষরূপে ঋণী। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমান উন্নতি প্রভৃত পরিমাণে ইংরাজী চর্চ্চার ফল স্বরূপ। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা পদ্য রচনা প্রণালী এতই পরিবৃত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে যে, প্রাচীন পদ্যের সহিত তুলনা করিলে ইহাকে সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। কাব্যকুঞ্জের কমনীয় মূর্ত্তিই সাহিত্যের জীবন এবং সদ্ভাবই কবিতার প্রাণ। উদার চিন্তা ও হৃদয়ের নিভৃত কথা কবিতা ভিন্ন আর কিছুতেই বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। কিছুদিন পূর্ব্বে এ দেশে ভাব-সন্নিবেশ অপেক্ষা শব্দ-যোজনার কৌশল কবি-কৌলীন্যের উৎকৃষ্টতর লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইত, অধুনা বঙ্গসাহিত্যে সে বিষয়ে বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। বঙ্গদেশে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাই বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার চরম পরীক্ষা ছিল, আপাততঃ সে বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত।

সৌভাগ্য-সুন্দরী যাঁহাদের গৃহ শোভান্বিত করিয়া রাখিয়াছেন, সাহিত্যের অমল ধবল

* প্রবন্ধের বাহুল্যভয়ে বহু সাহিত্যসেবীর নামোল্লেখ হইল না, ক্ষমা প্রার্থনীয়—লেখক।

ভাতি তাঁহাদের খুব কমই উচ্ছ্বাস করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের মরুভূমে আজ কাল একটু একটু বারিবিন্দুর সঞ্চার হইতেছে। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণও অনেকে বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। দেশের ধনী লোকেরা যদি বঙ্গসাহিত্যের সহায় না হন, তবে আর ইহার উন্নতি কিরূপে হইবে? জাতীয় অস্তিত্বের পরিচয়—জাতীয় ভাষা। যদি জাতীয়তা রাখিতে হয়—স্বজাতীয় ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখ। কিন্তু চির-প্রচলিত প্রবাদ আছে যে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী কখন এক গৃহে বাস করিতে পারেন না। তাঁহাদের সপত্নী-কোন্দল চিরপ্রসিদ্ধ। কমলা দেবীর সুখ সিংহাসন যে গৃহে জুড়িয়া থাকে, সে গৃহে বীণাপাণির সুধা-ঝঙ্কার কখনও শ্রুত হয় না। তবে বঙ্গমাতার সুসন্তানগণ যখন বাঙ্গালার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছেন, তখন ভরসা হয়, বাঙ্গালায় লক্ষ্মী সরস্বতীর চির-বিবাদ মিটিবার দিন বুঝি আর সুদূরপরাহত নহে। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বসু।

## প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১৮। প্রবাহিনী। শ্রীললিতমোহন সেন প্রণীত, মূল্য ।০। তরুণ জীবনের কাহিনী,—গ্রন্থকার এখন প্রৌঢ়,—এই সময়ের লেখা দেখিলে বুঝিতে পারিতাম, কেমন উন্নতি হইতেছে। গ্রন্থকারের লেখনী একটু সংযত হইলে অনেক সুন্দর লেখা বাহির হইবে বলিয়া আশা করি। নিখুঁত করিবের আভাস এ পুস্তকে অনেক আছে।

২৯। Village Panchayet Sheeme, by Rai-kanya Lala Sing, Hon Secretary

পঞ্চায়েত প্রথা সংশোধনের জন্য আন্দোলন তুলিয়া গ্রন্থকার দেশের পরম মঙ্গলের পথ খুলিয়া দিয়াছেন। সকলের বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। অনেক সার সত্য এই পুস্তকে আছে।

৩০। ব্রাহ্মগণ হিন্দু কিনা? শ্রীবটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০। এ পুস্তকে সংসাহসের বিশেষ পরিচয় আছে, তাহা আত্ম-দর্শনের সুফল। লেখা ভাল।

৩১। বিশ্বাস ও প্রেমের জয়। শ্রীশশিভূষণ বসু কর্ত্তৃক বিবৃত। মূল্য ।০। লেখা মন্দ নয়।

৩২। চাণক্য-নীতিসার-সংগ্রহ। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন সম্পাদিত। মূল্য ৵০, চাণক্য শ্লোকের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ ও ইংরাজী অনুবাদ। অতি সুন্দর পুস্তক। এই পুস্তক গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় ঘরে ঘরে রাখা উচিত।

৩৩। স্বাস্থ্য ও শতায়ু। শ্রীসতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, বি-এ, প্রণীত, মূল্য ১৲। আত্ম-প্রতিষ্ঠার উপদেশ সকল শিক্ষার সার উপদেশ। গ্রন্থকার কি উপায়ে পরমুখাপেক্ষী না হইয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে থাকিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যাইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "নূতন রোগ, চিকিৎসার দোষে, খাওয়ার দোষে, পোষাকের দোষে, স্নানের দোষে, পুরাতন ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া পড়ে।" কথা গুলি বড়ই সত্য, সংযম ভিন্ন কোন রোগই আরোগ্য হয় না। গবেষণাপূর্ণ এবং সুলিখিত প্রবন্ধ কয়টী পড়িয়া বড়ই সুখী হইলাম।

৩৪। গিরি-কাহিনী। শ্রীবিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প। খাসিয়াদিগের অনেক কথা জানা যায়। ভাষা প্রাঞ্জল ও মধুর।

৩৫। ভারত-প্রদক্ষিণ। শ্রীদুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত, মূল্য ২৲। চিত্র। পূর্ব্ব সংস্করণের বিষয় এই সংস্করণে যুক্ত হইয়াছে। ছাপা ও বাঁধা পরিপাটী। অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে গ্রন্থখানি পূর্ণ। সকল দেশের বিশেষ বিবরণ পড়িতে কৌতূহল জন্মে। পুস্তকখানি উপন্যাসের ন্যায় সরস।

৩৬। কালিদাস। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত, মূল্য ।৵০। কালিদাসের আবির্ভাব-কাল ও রঘুবংশ সমালোচনা। গভীর গবেষণা, ভাষার পারিপাট্য, চিন্তার গাম্ভীর্য্য মিলিয়া এক অপূর্ব্ব জিনিসের উদ্ভব করিয়াছে। বিজয় চন্দ্রের বিশেষত্ব এই, তিনি যাহা লেখেন, তাহাই সুন্দর এবং সরস হয়। পুস্তকখানি সুধী-সমাজে বিশেষরূপ আদৃত হইবে বলিয়া আশা করি।

# স্বদেশি-ভক্ত।

'স্বদেশ স্বদেশ করিস্ বটে, স্বদেশ যে কে তোদের নয়।'

স্বদেশী কে? যিনি স্বগ্রামের, স্বজেলার, স্বপ্রদেশের ও স্বদেশের যথার্থ কল্যাণ চেষ্টা করেন, তিনিই স্বদেশী। কলিকাতার স্বার্থের জন্য যিনি আপন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারেন, বাঙ্গালার মঙ্গলের জন্য যিনি কলিকাতার স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত এবং ভারতের কল্যাণ সাধনে যিনি বাঙ্গালার স্বার্থ বিস্মৃত হইতে পারেন, তিনি প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত, দেশহিতৈষী মাতৃভূমির সুসন্তান।

স্বদেশীর অনুরাগে শঠতা নাই, প্রেমে আবিলতা নাই, সেবায় স্বার্থের পূতিগন্ধ নাই। স্বদেশীর জীবন তাহার বিলাস-সিদ্ধির জন্য নহে, জন্মভূমির কর্ম্মসাধনের নিমিত্ত। স্বদেশীর উদ্দেশ্য স্বদেশ, সাধন স্বদেশ, আরম্ভ স্বদেশ, পরিণতি স্বদেশ। স্বদেশ তাঁহার অস্থিমজ্জা, স্বদেশ তাঁহার প্রাণ, স্বদেশ তাঁহার ধ্যান ধারণা, স্বদেশ তাঁহার যোগসাধন।

স্বদেশকে যে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিবে, তাহার স্বতঃই ইচ্ছা হইবে, স্বদেশ-সেবা করিতে। যাহাতে স্বদেশের সর্ব্ববিধ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, যাহাতে স্বদেশের কোনরূপ অকল্যাণ না হয়, যাহাতে স্বদেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান-ঋদ্ধি-শিল্প-ধর্ম্ম-নীতি-বাণিজ্য-সম্পদ-সম্পন্ন ও যশো-গৌরবে গৌরবান্বিত হয়, ইহাই স্বদেশ-সেবকের কামনা, লক্ষ্য ও চেষ্টার বিষয়। কল্যাণ বলিতে তাহাই বুঝায়, যাহা পরিণামে শুভফলপ্রসূ। রুগ্ন সন্তানের কল্যাণের জন্য জননীর যেমন যত্ন, আকাঙ্ক্ষা ও কাতরতা, স্বদেশের মঙ্গলের জন্য দেশ-হিতৈষীর তেমনই চেষ্টা ও সাধনা আবশ্যক। চিত্ত-বৃত্তি সংযত করিয়া ধীরভাবে বিচক্ষণতার সহিত সকল অবস্থা আলোচনা করিয়া বুঝিতে হইবে, জন্মভূমির ভাবী মঙ্গল কি এবং তাহা কিরূপে সম্ভব।

ইংরাজ রাজ্য আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে পর আমরা ইংরাজী পড়িয়া, ইংরাজের সঙ্গে মিশিয়া, তাহাদের ধরণ করণ দেখিয়া, তাহাদের অনুকরণে স্বদেশপ্রেম বা পেট্রীয়টিজম শিখিয়াছি। ইংরাজের ভাব ও ভাষা, শাসন-প্রণালী ও আইন, নীতি ও সংসর্গ আমাদিগকে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, স্বাধীন মত, স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন আচরণ শিক্ষা দিয়াছে। ফলে আমরা স্বায়ত্তশাসন চাই, স্বরাজ দাবী করি, রাজনৈতিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করি, রাজপুরুষদিগের কার্য্য সমালোচনা করি, বিদেশী মাল বয়কট করি, ও স্বদেশী গ্রহণের জন্য সভা করিয়া বক্তৃতা করি। ইংরাজ গুরু হইয়া যাহা শিখাইয়াছেন, আমরা শিষ্য হইয়া তাহা শিখিয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতা, স্বায়ত্ত শাসন, স্বরাজ ও রাজনৈতিক অধিকারভোগ ইংরাজ চরিত্রে রক্তগত। স্বদেশপ্রেম ইংরাজের অস্থিমজ্জা ও মেদমাংস ভেদ করিয়া শোণিতে সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু সে ধার করা স্বদেশ-হিতৈষণার সাময়িক উত্তেজনা আমাদের স্থূল চর্ম্ম ভেদ করিয়া মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারেনা। অতএব আমাদের আছে ভাব, কল্পনা ও ভাষা। তাহাদের আছে বেদনা, অনুভূতি

ও ক্রিয়া। আমাদের আছে অভিনয়, তাহাদের আছে জীবনমরণসমস্যা, আমাদের আছে স্বার্থসাধন, তাহাদের আছে স্বার্থত্যাগ; আমাদের আছে কপট প্রেম, আহাদের আছে সরল সহজ প্রাণের টান, আমাদের আছে হুজুগ ও চীৎকার; আহাদের আছে ধীরতা ও সুবিবেচনা, আমাদের আছে স্বদেশ-সেবার নামে দেশের ও দশের সর্ব্বনাশ করিয়া স্বোদর পূরণ, তাহাদের আছে দেশের ও দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ ও সর্ব্বস্বত্যাগ। এই হেতু তাহারা প্রতি কার্য্যে কৃতকার্য্য, আমরা প্রতিপদে লাঞ্ছিত ও বিফল-মনোরথ।

আমাদের-স্বদেশ প্রেম আদ্যন্ত পোষাকী ধরণের, কৃত্রিমতা-দুষ্ট। সুতরাং আমাদের স্বদেশীর বোধনের পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন হইয়াছে। স্বদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত স্বদেশপ্রেমে মত্ত আমাদের আদি স্বদেশী কবি, বীণাতানে ঝঙ্কার দিয়াছিলে,'বাজরে বীণা বাজ এই রবে।' এবং ইংরাজের অনুকরণে স্বাধীনতার উত্তেজনায় বীরদর্পে উদ্দীপনা-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেনঃ—

'ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।'

কিন্তু তিনি জানিতেন, ইংরাজরাজ শান্তিরাজ্য সংস্থাপন করিয়া এদেশকে অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অতএব তিনি সামলা মাথায় দিয়া ইংরাজ ধর্ম্মাধিকরণে যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিতেন।

আর এক স্বদেশী কবি, আমাদের মির্জাফরকে ধিক্কার দিয়া, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ঠাটকারী দিয়া ওজস্বিনী ভাষায় লিখিয়াছিলেন,

'কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র-কিরণ!'

কিন্তু স্বয়ং আজীবন ঘৃণিত দাসত্বে বিবেক বিক্রয় করিয়া অন্তিমে আত্মজীবনীর শবচ্ছেদ করিয়া সাধারণের সম্মুখে গুপ্তব্যাধি উদ্ঘাটন করিয়া অমর হইয়াছেন।

আমাদের আর একজন স্বদেশী কবি দাসত্বোপার্জ্জিত ঘৃতান্ন ভোজন করিতে করিতে কল্পনার ঘুমঘোরে সেতারে সুর বাঁধিয়া গাহিয়াছেন—"হেলায় লঙ্কা করিল জয়"। আমাদের স্বদেশী সাহিত্যসম্রাট্ সকলের গায় 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের লঙ্কার ঝাল ছিটাইয়া দিয়া স্বয়ং শ্যাম-অঙ্গে বায় বাহাদুরের চন্দন বিলেপন করিয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলেন। আমাদের শেষ স্বদেশী কবি-সম্রাট ভক্তিভরে স্বদেশস্তোত্র গাহিয়াছিলেন,-

'অয়ি ভুবনমনোমোহিনি!' এবং

'প্রথমসামরব তব তপোবনে।'

এই অনুকরণ-যুগের বাঙ্গালী কবি এখন বলিয়া ধন্য হইয়াছেন—"The East is wedded to the west on the alter of humanity."

আমাদের বাক্যে ও কার্য্যে কত অন্তর।

আমরা ইংরাজী পড়িয়া সাহেব সাজিয়া কবি সখের স্বদেশী মেলা *। ইংরাজেরা ও জীবিত দেশের লোকেরা তাহাদের ভাবে অবস্থার প্রেরণায় জীবন-সংগ্রামে জীবিকার উপায়ের নিমিত্ত উদ্ভাবন করিয়াছিল, 'শিল্প প্রদর্শনী মেলা'। স্বদেশীর সাময়িক উত্তেজনায় আমাদের বাগ্মী নেতাদিগের বক্তৃতায় চঞ্চল হইয়া আমরা স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করি-

* সে স্বদেশী মেলায় আনন্দের ফোয়ারা ছুটে, তাহার বিজ্ঞাপন ছাপা হয় বিলাতী কাগজে। সেখানে নহবত বাজে। বিলাতী দ্রব্যে পরিপূর্ণ করা এসেন্স,তৈল,চাটনির নিত্য লীলা। সেখানে স্বদেশীপূত ম্যাজিক ও বায়োস্কোপ দেখান হয়,চা চুরুট চলে। নানা ভেকী ও নানা রং-বেরংয়ের কত আনন্দ, কত উচ্ছ্বাস, কত কেলী। প্রকৃত "স্বদেশী" নির্ব্বাণ হইয়া যাইতেছে, সে জন্য একটুও দুঃখ নাই, আনন্দের উচ্ছ্বাসে মঞ্চলে বিভোর। ঃ স.

য়াছিলাম। তাহার ফলে চারিদিকে দেখিতে পাই, কেবল সুবাসিত তৈল; এসেন্স, সাবান ও জীবন-বীমা-কোম্পানী।। মুম্বই অঞ্চলে লোকেরা বঙ্গভঙ্গের বহুপূর্ব্বে স্বদেশী করিয়া মোটা কাপড়ের কল করিয়া চীন ও জাপান হইতে অর্থ আনিতে শিখিয়াছিল। এখন আমাদের বাঙ্গালায়ও তাহারা বসনের জাল ফেলিয়া ধন ছাঁকিয়া লইতেছে, জীবন-সমস্যার প্রধান রহস্য লৌহকারখানার যৌথ-কারবারে কৃতকার্য্যতা দেখাইয়া ধনবান ও যশস্বী হইয়াছে। আমরা গড্ডলিকা, কেবল পুতুলের ছাঁচ। স্বদেশের নামে মর্ম্ম তুলিয়া আমরা বাতারাতি বড়মানুষ হইয়াছি। স্বদেশী যৌথবাণিজ্যের হুজুগ তুলিয়া কাপড়ের কল, বীমা কোম্পানী, জাহাজ কোম্পানী, ষ্টোর সাপ্লাই, ভাণ্ডার ও প্রভিডেণ্ট ফণ্ড আরও কত বহু বেঙ্গের ছাতার ন্যায় বেঙ্গাস কোম্পানীর নামে বিধবার মুখের গ্রাস, দরিদ্রের কষ্টোপার্জ্জিত কড়ি কাড়িয়া লইয়া আমরা ত্রিতল অট্টালিকার বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়ায় সুখে নিদ্রা যাইতেছি, এবং মনে মনে ভাবিতেছি, আমরা কি চতুর।

আমাদের সকল স্বদেশী-চেষ্টা ব্যর্থ হইবার কারণ কি? আমরা রোগ না বুঝিয়া যে যাহা বলিতেছে, তাহাতেই নাচিয়া উঠিতেছি, আর ভাবিতেছি, মুক্তি বুঝি এই পথে। কেহ নামের ও যশের জন্য, কেহ স্বার্থসাধনের জন্য, কেহ শুধু 'একটা কিছু করিবার জন্য, কেহ বা কোন উদ্দেশ্য না থাকিলেও বুদ্ধির দোষে ভুল বুঝিয়া স্বদেশ-সেবার নামে যে হুজুগ তুলিয়া দিতেছে, আমরা তাহাতেই মাতিয়া তাহাদের যুক্তি ও উপদেশ নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিতেছি। তাহারা চতুর, জাপনা বাঁচাইতে জানে, আমাদিগকে গাছে তুলিয়া দিয়া মই লইয়া সরিয়া পড়িতেছে, এবং শেষকালে দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িতে পরামর্শ দিতেছে। আমরা মূর্খ, আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া হাবুডুবু খাইতেছি। অতিকায় দৈত্যের সহিত বামনের বন্ধুত্ব হইলে যে পরিণাম, আমাদের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিতেছে।

যাহারা নিজে অন্ধ, তাহারা নেতৃত্ব করিয়া অপরকে চালাইতে গেলে যে ফল হয়, যাহাদের উদ্দেশ্য সাধু নয়, তাহারা চালক হইলে যে পরিণাম হয়, যাহারা দারিদ্রবোধহীন, তাহারা দারিদ্র গ্রহণ করিলে সকলের ভাগ্যে যাহা ঘটে, যাহাদের সততা নাই, তাহাদের উপর সাধারণে নির্ভর করিলে দেশের যে দুর্গতি হইতে পারে, যাহারা স্বার্থের কীট, তাহারা স্বার্থত্যাগের ভাণ করিয়া স্বদেশ-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিতে গেলে যাহা হওয়া উচিত, যাহারা বচন-সর্ব্বস্ব কর্ম্মে অপটু, তাহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া মোড়ল হইলে যে ফল আশা করা যাইতে পারে, এবং যাহারা কল্পনা ও উচ্ছ্বাসের দাস, অপর দেশের ইতিহাস ও রাজনীতি পড়িয়া আমাদের ভিন্ন অবস্থার সহিত তুলনায় তাহার প্রয়োজন না বুঝিয়া প্রয়োগ করিতে তৎপর, তাহাদের পতাকার নিম্নে মেষপালের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলে অদৃষ্টে যাহা হওয়া উচিত, তাহা সকলই হইয়াছে। বুদ্ধিমানের নিকট আমাদের জয়ের আশা কোনদিন ছিল না এবং এখনও নাই। আমাদের স্বদেশী উদ্যম ব্যর্থ হইবার কারণ কেবল 'necessary mental and technical equipment' এর অভাব নহে। আমাদের এ নিষ্ফলতা কৃতকার্য্যতার সোপান নহে। (failure is success in the embryonic stage—in a state

of chrysalis )। আমাদের এ অকৃতকার্য্যতা জাতীয় আশা ভরসার সমাধি।

আমাদের যাঁহারা নেতা হইয়াছেন, আমরা নেতা না বলিলেও যাঁহারা আপনাদিগকে জননেতা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের কেহ নিঃস্বার্থভাবে নিষ্ঠার সহিত স্বদেশী করেন কিনা,জানিনা। কিন্তু স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হইবে, তাহা হয়ত তাঁহারা ভাবেন নাই, অথবা ভাবিয়াও বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহারা সাময়িক উত্তেজনার বশে কল্পনাবলে যাহা ভাল মনে করিয়াছেন, তাহাই করিতে যাইয়া তাঁতিকুল বৈষ্ণবকুল উভয়কুলই হারাইয়াছেন। তাঁহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যে ডাল ধরিয়াছেন, সে ডালই ভাঙ্গিয়াছে।

কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, বিলাতী মাল বয়কট কর, আমাদের নান্যঃ পন্থা। স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশীবর্জ্জন প্রতিজ্ঞা কর। বিলাতী মাল ছুঁইও না, খাইও না, তাহার নামও করিও না, "কালরূপ আর হেরব না"। কিন্তু তখন বিলাতী মালে আমাদের বাজার পরিপূর্ণ। আমাদের অভ্যাস, ও রীতিনীতি অনুযায়ী দ্রব্য আমাদের দেশে অল্পই জন্মিত। অতএব বয়কট করিয়া আমরা বহুদিনের অভ্যাস, প্রয়োজন ও রীতি নীতি হঠাৎ পরিবর্ত্তন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। প্রকৃতি ও অবস্থার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলাম। নেতাদিগের যুক্তি, বয়কট করিলেই স্বদেশে আবশ্যকতানুযায়ী জিনিস প্রস্তুত হইবে। গাড়ীর সম্মুখে ঘোড়া না জুতিয়া তাঁহারা ঘোড়ার সম্মুখে গাড়ী জুতিলেন। যাহা অসম্ভব, তাহা সম্ভব হইল না। আমাদের প্রতিজ্ঞা জলবুদ্বুদের ন্যায় শূন্যে বিলীন হইল। এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপরাধী যাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তাহারা নহে, যাহারা প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিল, তাহারা। নেতৃগণ স্বয়ংই জনসাধারণের বহুপূর্ব্বে স্বখাতসলিলে ডুবিয়াছিলেন। আমাদের শিল্পী ও কারিগরগণ আসরে নামিয়া তাহাদের বন্ধু বণিকগণের সহযোগে স্বদেশী হুজুগে সদুপায়ে হউক অসদুপায়ে হউক, যত বাবিশ মাল চালাইয়া অর্থাগমের উপায় করিতে লাগিল। কাকের মাংস কাকে ভক্ষণ করিল। যে সকল দরিদ্রের একটী পয়সা জীবন মরণ, তাহাদের বুকের রক্ত শুকাইল বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া উল্টা প্রতিজ্ঞা করিল, 'নেড়া আর বেলতলায় যাইবেনা।'

কেহ কেহ ধুয়া তুলিলেন—পঁচিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই দেশে এই ধুয়া চলিতেছিল—টেক্‌নিক্যাল স্কুল ও কলেজ কর, বিলাতে ফ্রান্সে আমেরিকায়, জাপানে অসংখ্য যুবক ছাত্রসেনা প্রেরণ কর। তাহারা লোহার কাজ শিখিয়া আসিবে, কলের কাজ শিখিয়া আসিবে, নানা কারখানার ফন্দীতে ও কাজে ওস্তাদ হইয়া আসিবে,তোমাদের দুঃখ ঘুচিবে। দলে দলে আমাদের সোণার চাঁদেরা কেহ পড়িয়া কেহ বা না পড়িয়া পণ্ডিত হইয়া লঘুক্লেশে গুরুলাভ করিয়া বিজয় পতাকা উড়াইয়া ঘরে ফিরিল। কিন্তু এখন তাহাদিগের আহার যোগাইবে কে? আমাদের যৌথকারবার ও স্বদেশী কারখানা সকল সততা অভাবে আত্মকলহে, প্রভুত্বের প্রলোভনে ও হঠকারিতায় মাটী হইয়া গেল। অতি লোভে তাতি নষ্ট। আমাদের টেক্‌নিক্যাল শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা ষাঁড়ের গোবর হইয়া উদরান্নের জন্য এখন সাহেবী কোম্পানির দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে!

কেহ বলিলেন, তোমাদের বসন-ভূষণ তোমরা প্রস্তুত কর, লজ্জানিবারণের জন্য

পরের দ্বারস্থ হইও না। আমরা তাহাই বুঝিয়া একবেলা উপবাস করিয়া কষ্টে যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, আমাদের স্থূলোদর হিতৈষীদিগের হস্তে সঁপিয়া দিলাম। বুঝিলাম না, পরিণাম কি? আমাদের দেশে বিদেশীয়েরা চটের কল করিয়া রাজা হইয়া গেল, আর আমরা কাপড়ের কল করিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইলাম। আমরা মুখই হইতে তুলা আনিয়া বাঙ্গালায় কাপড়ের কল করিয়া লাভবান হইব, বক্তৃতার দেশে এ আশা দুরাশা। থাকিত যদি আমাদের সেই সততা, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণতা, সেই দায়িত্ববোধ, আমরাও মানুষ হইতাম। আমরাও মুখ উঁচু করিয়া আজ বলিতে পারিতাম, 'আমরা স্বদেশী'। আমরা পরের ধন হাতে পাইলে লোষ্ট্রবৎ মনে করি—তখন আমাদের নিকট 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। এই জন্যই আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে পারি না। যে কারণে অপরকে সমালোচনা করি, সেই কারণ উপস্থিত হইলে নিজেও আত্মসম্বরণ করিতে পারি না। সুতরাং আমাদের যৌথকারবার টিকিতে পারে না। আমাদের অতিবুদ্ধি সম্মিলিত ব্যবসায়ের প্রধান পরিপন্থি।

আমরা স্বদেশী করিয়া ভাবিয়াছিলাম, আমাদের ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পের উন্নতি হইবে, আমাদের ধনাগমের পথ খুলিয়া যাইবে। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে লাভবান হইল পাঞ্জাব, মুম্বই, ইয়ুল কোম্পানী, মার্টিন কোম্পানী, এলগিন-মিল, লালইমলী প্রভৃতি এবং কতক পরিমাণে পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানগণ। আমরা যে তিমিরে, সেই তিমিরে। আমরা বঙ্গবাসী স্বদেশী নেশায় বিভোর হইয়া খোতাম, পেন, নিব, পুতুল, ছবি, মোজা, গেঞ্জি, মোমবাতি, এসেন্স, সাবান ও সুবাসিত তৈল প্রস্তুত করিয়া স্বাধীনতার ও শ্রীবৃদ্ধির স্বপ্ন দেখিতেছি। যে কাজে আয়াস নাই, মূলধনের আবশ্যকতা নাই, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া শিক্ষার প্রয়োজন নাই, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন নাই, আমরা তাহাতে খুব তৎপর। এমন আরাম-প্রিয়, শ্রম-বিমুখ সততাশূন্য, চরিত্রহীন, সন্দিগ্ধচিত্ত, কুটিলমতি, পরশ্রীকাতর, হিংসুক জাতি স্বর্গে গেলেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না। মেকলের গালি শুনিয়া আমাদের চিত্ত চাঞ্চল্য হয়, ইংরাজের প্রতি রোষ জন্মে। কিন্তু আমরা যদি মানুষ হইতে পারি, শত মেকলে শতমুখে আমাদের প্রশংসা করিবে। আমাদের স্বদেশী কবিও কি আমাদের চরিত্র দেখিয়া ব্যথিত চিত্তে বলেন নাই—

ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি?

স্বদেশী আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে, আমাদের সকল উদ্যম নষ্ট হইবার কারণ আমাদের মনুষ্যত্বহীনতা। সভাসমিতি বল, শিল্প বাণিজ্য বল, জ্ঞান চর্চ্চা বল, সকলের মূলে জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক বল, জাতি ব্যক্তির সমষ্টি, অতএব সমষ্টি গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্যষ্টির প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। আমরা প্রত্যেকে যদি মানুষ হই, লোকে আমাদিগকে মানুষ বলিবে, আমাদিগের স্বজাতি মানুষের জাতি বলিয়া জগতের জনসমাজে গণ্য হইবে। আমাদের যদি সৎসাহস থাকে, মিথ্যা-প্রবঞ্চনা-অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-শঠতা-কটতার প্রতি ঘৃণা থাকে, শ্রমবল, বুদ্ধিবল ও জ্ঞানবল থাকে, একতা ও স্বদেশ-প্রেম থাকে, চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে, বাক্য ও কার্য্যের সামঞ্জস্য থাকে, ধৈর্য্য, বিচার, ও ভবিষ্যদ্দৃষ্টি থাকে, আমরাও মানুষ, আমরাও জাতি, আমরাও দশজনের একজন হইব।

আমাদের নামেও বাহবা পড়িবে, আমাদের জয় জয় কার ও দশের মুখে ফুটিয়া উঠিবে।

প্রকৃত স্বদেশী তাঁহারা, যাঁহারা ধান, যব, তিল, কলাই, আলু, মূলা, কচুর চাষ অপেক্ষা মানুষ-চাষে অধিক মনোনিবেশ করেন। আমাদের এ আন্দোলনে প্রকৃত স্বদেশী ভাবত সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ,লর্ড হার্ডিং ও কারমাইকেল, মাননীয় গোখেলে ও সার আশুতোষ, যাঁহারা লোক শিক্ষার বিধান করিয়া ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। জনসাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার হইলে,দেশে মানুষ প্রস্তুত হইলে, গ্রীসের ন্যায় পাথরের দেশে, ইংলণ্ডের ন্যায় কয়লার রাজ্যে, আমেরিকার ন্যায় মহারণ্যেও সোণা ফলিতে পারে। দেশে মানুষ থাকিলে তাহারা যাহাতে হাত দিবে তাহাতেই কৃতকার্য্য হইবে, জঙ্গলে মঙ্গল হইবে, ছাই মুষ্টি ধরিলে তাহা সোণা মুষ্টি হইবে। আমাদের নরনারী যে দিন এক এক জন এক একটী বীর বা বীরপত্নী হইবেন, সেদিন আমাদের গৃহে গৃহে আবার রাজপুতনার ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইবে। একজন গারিবল্ডী, একজন ওয়াশিংটন, একজন নেপোলিয়ন, একজন অশোক, একজন সেকেন্দার, একজন বুদ্ধ, একজন মহম্মদ, একজন সেক্সপিয়র, একজন কালিদাস, একজন হোমার, একজন বাল্মীকি, একজন গেটে, একজন দাঁতে, একজন ভল্‌টেয়ার, একজন নিউটন, একজন এডিসন যে জাতি প্রস্তুত করিতে পারে, সে জাতি ধন্য, তাহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী। কবে আমাদের দেশের বালবৃদ্ধ যুবা পুরুষরমণী একমন একপ্রাণ হইয়া সেই স্বদেশী-ব্রত গ্রহণ করিবেন, যাহাতে গৃহে গৃহে মানুষ প্রস্তুত হইবে? ভেজালের জঞ্জালে আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ হইল। চটকে ভুলিয়া,মোহে মজিয়া সময় নষ্ট করিবার আর অবসর নাই। রাজা প্রজা, ধনী দরিদ্র, জনসাধারণ সকলে মিলিয়া কায়মনোবাক্যে আপন আপন গৃহে শিশু-বালক যুবকদিগের সুশিক্ষার বিধান করিয়া মানুষ গড়িতে চেষ্টা করিলে যথার্থ স্বদেশসেবা করা হইবে, স্বদেশের কল্যাণ হইবে। ইহারই নাম আসল-স্বদেশী। যতদিন সকল হুজুগ ও বৃথা আন্দোলন ত্যাগ করিয়া এইরূপ প্রকৃত স্বদেশী অনুষ্ঠিত না হইবে, ততদিন

বাবুই তোর মিছে আশা,
ঘর থুইয়ে বনে বাসা।

শ্রীচাবুকরাম চৌরে

# মরীচিকা।

(১)

রাজা ক'ন "রাণি! অই মুখখানি,
মাখা'ন চাঁদের আলো,
তুচ্ছ সরোজিনী, মম সোহাগিনী
তার চেয়ে কত ভাল।"
রাণী ক'ন হাসি "এ আদর রাশি
কেন প্রভো, অধীনীরে,
জানি প্রিয়তম! অযোগ্যতা মম"
আঁখি দু'টী ভাসে নীরে।

(২)

সে নগরময় আনন্দ উৎসব,
মঙ্গল বাজনা বাজে,
সকলে তুলিছে সকল বেদনা,
বাল বৃদ্ধ হর্ষে সাজে।

শ্রমণা এসেছে সাধুর আগারে,
কল্যাণ করুণা যেন,
তাঁহারি গৌরবে, উল্লাস-প্রবাহ
উথলি উঠেছে হেন।

(৩)

রাণী ক'ন "নাথ। এ যে সুপ্রভাত
শুভদা শ্রমণা-তবে,
গ্রামবাসী সবে, মাতিছে উৎসবে,
বিমল ভকতি-ভবে,
আমরাও আজি হইব সফল,
তাপসীরে পূজা করি,
রাজা ক'ন হাসি, "আমি পূজি শুধু
আমার হৃদয়েশ্বরী।"

(৪)

সাগরের পানে ছুটিছে নর্ম্মদা
অযুত লহরী লয়ে,
শিকারীর বেশ— আসিলা ভূপতি
একাকী—পিপাসী হয়ে।
করপুটে সেই সুশীতল জল
পিয়ে জুড়াইল প্রাণ,
বিহঙ্গ কূজিত, নিরজন ঠাঁই,
অতি রমণীয় স্থান।

(৫)

দাঁড়ায়ে কিশোরী পরমা সুন্দরী,
বিশুভ্র বসন প'রা,
এলায়িত চুল, যেন বেল ফুল
সরলতা আঁখি-ভরা!
হেন ফুল নাহি, রাজ-উপবনে,
চমকিল নৃপবর,
মুহূর্ত্তে আসিয়া কিশোরীর পাশে,
দাঁড়াইলা রাজেশ্বর।

(৬)

আরণ্য-কুসুম অমূঢ়া অরুণা
দিলা নিজ পরিচয়,
ক্ষত্রিয়-দুহিতা দারিদ্র্যে পতিতা,
পাতার কুটীরে রয়।
রাজার করুণা লহরে লহরে,
উথলি উঠিল তায়,
এ হেন মোহিনী দীনের নন্দিনী
আহা, বুক ফেটে যায়।

(৭)

বলেন ভূপতি "হায় বুঝি সতি,
এ বংশ হইল লোপ"
রাণী ক'ন "সে কি?" "কেন বুঝ না কি,
পিতৃলোকে করে কোপ।
মোরা চিরদিন অপত্য-বিহীন"
রাণী হাসে মুখ চেয়ে,
"সবে বয়ঃ মোর উনিশ বছর,
হবে কত ছেলে মেয়ে।"

(৮)

রাজা ক'ন "বালা। সহে না এ জ্বালা,
তুমি দেবি, দয়া করি,
হও ভার্য্যা মোর—" নয়নের লোর
কপোলে পড়িল ঝরি।
"দারুণ সংগ্রাম, মিছা করিলাম
অবাধ্য চিত্তের সহ,
চাহি না রাজত্ব কি ছাই মহত্ত্ব—
তুমি কর অনুগ্রহ।"

(৯)

হাসিল অরুণা আননে আঁচল,
ফুটিল সহস্র ফুল,
নিরখি ভূপেশ ভাবে মনে মনে,
"বিধি মোরে অনুকূল।
হেন রূপ রাশি যাবে অযতনে
সে কি সহে?—কভু নয়,
বুঝাব রাণীরে বুঝিবে সরলা,
আর কারো নাহি ভয়!"

(১০)

রাজা ক'ন "রাণি! কেহ যদি আসে
সপত্নী হইয়া তব,
তাহার উপরে আসন তোমারি",
আমি না কৃতঘ্ন হ'ব।"
রাণী ক'ন "ছিছি, বার এ তামাসা,
আমি নাহি ভালবাসি,
তোমার হৃদয় শুধু আমা ময়,
(সেথা) রাজরাজেশ্বরী দাসী।"

(১১)

সাধুর-আগারে শ্রমণা কল্যাণী
তপস্যার মূর্ত্তি সমা,
চারি দিকে বসি সাধু সাধ্বী কত,
দেবদেবী মাঝে রমা।
বর বেশ ধরি আসিলা ভূপতি,
অতি পুলকিত চিতে,
তাপসীর শিষ্যা অরুণার সনে,
বিভা তাঁর গোধূলিতে।

(১২)

সহসা স্মরিলা সেই মুখখানি,
যে মুখে চন্দ্রমা আঁকা,
সেই রাজরাণী দেব-বালা খানি
কি পবিত্র প্রেম মাখা।
হেন অপমানে দলিয়া তাহারে
আজি নব পরিণয়,
কই সে অমিয় এ যে মরীচিকা,
এ কি বিভো! দয়াময়!

(১৩)

কিন্তু আর নাহি ফিরিবার বেলা—
সুতরাং—শুভদৃষ্টি,
চকিত নৃমণি— এ যে সেই রাণী!
ঘুরি গেল বিশ্ব সৃষ্টি।
শ্রমণার পায়ে পড়িলা কাঁদিয়া
"কহ মা' কি বিবরণ"
হাসিয়া তাপসী কহেন আশ্বাসি
"ভয় নাহি বাছাধন।"

(১৪)

বলেন তাপসী "পতিব্রতা সতী
"হে ভূপ! মহিষী তব,
নারায়ণ রূপে পূজেন তোমারে
নিত্য প্রেম অভিনব।
তুমি হীন শক্তি চিত্তে নাহি ভক্তি
চঞ্চল রূপের দাস,
তাই ত্যজি সতী হায় মূঢ় মতি,
এ বিবাহে অভিলাষ!

(১৫)

"পেয়েছে অরুণা অতুল বিভব,
'রাণী গিরি' তুচ্ছ তা'য়.
কহিয়া সকলি এনেছি রাণীরে,
পতির দারুণ দায়,
আসিলা সুব্রতা সতী পতিব্রতা,
তব সনে দিনু বিয়া,
আর কোন মতে যেও না অপথে,
সুখে ঘর কর গিয়া।

১৬

রূপের লালসা কেন হেন মনে
রূপ সে কদিন তবে?—
ফুটন্ত গোলাপ পড়ি যায় ঝরি,
বসন্ত নিদাঘে মরে।
সৌন্দর্য্য কোথায়?— পবিত্রতা মাঝে,
অন্যত্র কালাগ্নি শিখা,
পতঙ্গের মত মরে মূঢ় জন,
রূপ মোহ মরীচিকা!

১৭

"বিভা নহে খেলা, বিধির আদেশে,
মিশি যাবে যুগ প্রাণ,
নদ নদী মিলি ছোটে সিন্ধু পানে,
লক্ষ্য সেই ভগবান।
ভাবি পরস্পরে বিধি দত্ত-নিধি
পালিবে দম্পতি-ধর্ম্ম।"
সলাজে নৃপতি নামিলা চরণে,
বুঝিলা সতীর মর্ম্ম।

শ্রীবীরকুমার-বধ-রচয়িত্রী

# ঠাকুর কাশীনাথ।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বের কথা। নীল-তোয়া নবগঙ্গা তখন রুদ্ধ-স্রোতা হয় নাই। ইহার শ্যাম সৈকত তখন বেতসরাজি ও কণ্টক-লতা সমাকীর্ণ ছিলনা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বহরের নৌকা তখন গর্ব্বে পাল তুলিয়া ইহার বক্ষে সলিলরাশি আলোড়নে তরঙ্গ হিল্লোল সৃজন করিয়া চলিয়া যাইত। কূলে কূলে দেব-অর্ঘ্যের পুষ্পরাশি কুড়াইয়া নীলকান্ত মণির ন্যায় স্বীয় বক্ষে ধারণ করিয়া নবগঙ্গা তখন ভরা যৌবনে ছুটিয়া খেলিয়া বেড়াইত। নব গঙ্গার উভয় কূলেই অনেক-গুলি বিশিষ্ট গণ্ডগ্রাম। ইহারই কোন গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশে ঠাকুর কাশী নাথের জন্ম। কথিত আছে, ইঁহাদের আদি বাসস্থান কুমার নদের তীরে ছিল। ইঁহার পিতা শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ছিলেন, কার্য্যো-পলক্ষে নবগঙ্গা কূলে এই গ্রামে আসিয়া এক ব্রাহ্মণ গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণের একটী বিবাহ-যোগ্য, অসীম রূপ-লাবণ্যবতী কন্যা ছিল, তিনি তাঁহার রূপ-রাশিতে মুগ্ধ হইয়া পিতা ভ্রাতাদিগের মত জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ মোহিনী কন্যাকে বিবাহ করেন। সে কালে স্বমতে বিবাহ সমাজের পিনাল কোডে গুরুতর দাণ্ডার্হ ছিল। তিনি নব পরিণীতা বধূকে লইয়া স্বগ্রামে গেলে তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া কুমার নদ পার করিয়া দেন, তাই পূততোয়া নবগঙ্গাতীরে তিনি স্থায়ী বাসগৃহ স্থাপন করেন। তাঁহার নামে শুষ্কপ্রায়া নবগঙ্গা এখনও গৌরব-তোয়া। ঐ বিবাহের অতুল্য ফল স্বরূপ মনীষী কাশীনাথ নবগঙ্গা-কূল আলোকিত করেন। তিনি নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া স্বীয় যশ চতুর্দ্দিকে বিকীরণ করেন, কিন্তু অর্থাগম দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিলনা। তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় সংসারে থাকিয়াও সংসারে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। সংসারের অস্থায়িত্ব ইহার প্রপঞ্চ, ইহার মাদকতা তাঁহার প্রাণকে দিবানিশি ব্যথিত করিত। এই ভব-বন্ধন হইতে কিসে মুক্তিলাভ হয়, কিসে সেই সত্য সনাতন চিন্ময় পুরুষে আত্মলীন হয়, কাশীনাথের তন্ময় চিত্তে কেবল সেই চিন্তা। তিনি বিশ্বেশ্বরকে মহাশক্তি রূপে চিন্তা করিয়া শক্তির উপাসক ছিলেন। "একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মম পরা"—এই উক্তি-বাদিনী বিশ্বশক্তিকে দশভূজা দুর্গারূপে চিন্তা করিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেন। তাঁহার জীবনের একটী মাত্র ঘটনার আমরা উল্লেখ করিব। তাঁহার ধর্ম্মের সহিত সকলের সহানুভূতি না থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া, ভক্তিপ্রণত চিত্তে তাঁহাকে অভিবাদন না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, যে অমূল্য বিশ্বাস হৃদয়ে পাইয়াছে, সে পরম রত্ন পাওয়ার অধিকারী হইয়াছে।

কাশীনাথ প্রতিবৎসর শারদীয় দুর্গা পূজা করিতেন। স্বীয় হস্তে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজাইয়া দুর্গোৎসব করিতেন। ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের অন্ন ও বনজ খাদ্য দ্রব্যে দেবীর মহাভোগ

নিবেদিত হইত। কাশীনাথের পর্ণকুটীরস্থ দেবী প্রতিমার সম্মুখে বিশাল-সলিলা খরস্রোতা নবগঙ্গা। শত সহস্র নৌকা পূজার আনন্দে যাত্রী বক্ষে লইয়া ছুটিত। নিকটস্থ গ্রামে ধনীগৃহে মহা সমারোহে শারদীয় মহাপূজা হইত। নৃত্য গীত বাদিত্রে চতুর্দ্দিক মুখরিত। শরতের সুবিমল আকাশছবি নবগঙ্গার নীলজলে পড়িতেছে; ভুবনমোহন শশাঙ্ক সেই কাল জলে মুখ লুকাইয়া জগতে শক্তিপূজা দেখিতেছেন, পাছে তাঁহার কোমল মুখের দিকে চাহিয়া শক্তি-সন্তান অশক্ত হইয়া পড়ে। নবগঙ্গার নীলজল জয় মাল্য স্বরূপ রক্ত জবা পরিয়া ছুটিতেছে। সেই শারদীয় পূজা কালে শক্তিপুরের স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী ভুবনমোহন দেব নৌবিহারে বহির্গত হইয়া এই গ্রামে আইসেন ও ঘণ্টারাত্তে দুর্গোৎসব হইতেছে শুনিয়া কাশীনাথের কুটীরে সমাগত হন। বিশিষ্ট অতিথির আগমনও কাশীনাথের ধ্যান ভাঙ্গিতে পারিল না। তিনি তখন হৃদয়ের নিভৃত রাজ্যে মায়ের মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন। অতিথিশ্রেষ্ঠ নির্নিমেষ নেত্রে পরম ভক্তের ভক্তি দেখিয়া বিমোহিত। পূজান্তে ঠাকুর কাশীনাথের সমীপস্থ হইয়া প্রথমে দেবীর ও পরে ব্রাহ্মণের পদে যাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া প্রার্থনা করিলেন, "আপনি উপযুক্ত আয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর গ্রহণ করিয়া মায়ের পূজা করুন।" তেজঃপুঞ্জ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা উপেক্ষা করিলেন, পরে রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে একটী করিয়া মহিষ বার্ষিক লইতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজার সহিত এই স্বত্ব করিলেন যে, নবমী পূজার দিন যথাসময়ে তিনি মহিষ পাঠাইয়া দিবেন।

কয়েক বৎসর গত হইল। এবারে নবমী পূজার তিথি বড় অল্প, ৯ দণ্ডের মধ্যে পূজা সমাপন করিতে হইবে। কাশীনাথ দেবীর উদ্বোধনান্তে মহিষ বলির সংকল্প করিয়া পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু নবমী গতপ্রায়, "মহিষ" আসিল কোথায়? অশিক্ষিত মহিষরক্ষক তিথির মূল্য বোঝে কি? সে আপনার সুবিধামত মহিষ আনিতেছে, এ দিকে বেলা ৮ দণ্ড অতীত। হায়! হায়! কাশীনাথের সঙ্কল্প ভঙ্গ হইবার উপক্রম। কাশীনাথ কাঁদিয়া বলিলেন "শিবশক্তি সংহারিণি! এ আবার কি পরীক্ষা?" কুশাসন হইতে উঠিয়া ধর্ম্মপত্নীর নিকটে গেলেন, তিনি জগদম্বার মহাভোগ রন্ধন করিতেছিলেন। কাশীনাথ কাতরকণ্ঠে বলিলেন "সর্ব্বনাশ হইল, আমার সঙ্কল্প ভঙ্গ হইল, এতদিনে মহামায়া সত্যভ্রষ্ট করিলেন, মহিষের ত সংবাদ নাই, এখন উপায়"। ব্রাহ্মণী সগর্ব্বে উত্তর করিলেন, "ইহার অন্য ব্যবস্থা কি?" কাশীনাথ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন "মহিষের পরিবর্ত্তে নরবলি"। তখন দৃঢ়তার সহিত গৃহিণী বলিলেন "তোমার ত ৪টী পুত্র আছে, একটী বলি দাও"। জ্যেষ্ঠ অবধ্য, মধ্যমপুত্র নবকুমারকে তখন নবগঙ্গাসলিলে স্নাত করিয়া চণ্ডীমণ্ডপে আনয়ন করা হইল। সমস্ত গ্রাম এই লোমহর্ষণ ব্যাপারে টলটল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছুটিয়া আসিল, কাশীনাথ জবা মাল্য গলে পরাইয়া রক্তচন্দন অনুলেপন করিয়া সন্তানকে দেবী সম্মুখে আনয়ন করিলেন। সন্তান দেবী চরণে উৎসর্গ করিলেন, সুকুমার সন্তানের কণ্ঠ সর্ব্বসংহারী হাড়-কাষ্ঠে দিলেন। শাণিত খড়্গ উত্তোলিত, কোথায় নবকুমার? হায়! হায়! নবকুমারের কমনীয় দেহ দ্বিখণ্ড, শোণিত ধারে বসুধা সিক্ত! ছিন্ন শির হইতে মহাতেজে রক্তবান ছুটিতেছে। অপর পার হইতে চীৎকার

শোনা গেল "মহিষ-পার করিয়া লও"। আর মহিষ! করালিনী মহাবলি গ্রহণ করিয়াছেন, মহিষ লইলেন না।

"বনের মহিষ অজা মায়ের বাছা মা সে বলি লন না,
যদি বলি দিতে আশ স্বার্থ কর নাশ বলিদান কর বিষয় বাসনা"

ভূবনারায়ণ মহিষ বন্ধ করিয়া দিলেন।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

# মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন-কথা।

গৃহ-লীলা।

ব্লাভাস্কি-প্রদর্শিত অলৌকিক ক্রিয়া বর্ণন দ্বারা লোকের চিত্ত চমৎকৃত করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। বৃথা কাল্পনিকতার প্রশ্রয় দিতেও আমরা প্রস্তুত নহি। কিন্তু ব্লাভাস্কীর জীবন ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্থূল বিশেষে দুই একটী ক্রিয়া বর্ণন করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার জীবনের বিশেষ বিশেষ সন্ধি স্থলে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, বা তিনি যাহা যাহা করিয়াছেন, সে গুলি কিছু কিছু না জানিলে তাঁহার চরিত্রের ক্রম-বিকাশ আমরা বুঝিতে পারিব না। যে কারণ-পরম্পরায় তাঁহার অমানুষিক প্রতিভার উন্মেষ ও প্রকাশ হইতেছিল, উহা যে কতক পরিমাণে তাঁহার প্রথম জীবনের কার্য্যমূলে অনুসন্ধেয়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। সুতরাং উহার পূর্ব্বাভাস না পাইলে উত্তর-চরিত্রের পরিণতি অনুধাবন করা কঠিন। তার পর, আমরা এ স্থলে ব্লাভাস্কি-জীবনের যে সময়ের কথা বর্ণনা প্রবৃত্ত, সেই সময়ে ইয়ুরোপ খণ্ডে অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের কেহ কোন সম্বাদ রাখিত না। এ বিষয়ের সন্ধান করা এক প্রকার বাতুলতা বলিয়া পরিগণিত হইত। স্থূলাতীত কোন পদার্থে কাহারও বড় একটা বিশ্বাস ছিল না। জড়-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে কর্ণপাত করিতেও কেহ ইচ্ছুক ছিল না। এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারে দেশের একাংশ আচ্ছন্ন, অপরাংশ অজ্ঞানে নিমজ্জিত। এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রচলিত ধর্ম্ম এক দিকে বিজ্ঞানের কঠোর আঘাতে আহত, কাজেই অপরাংশের অজ্ঞানাবলম্বনে কোনরূপে ক্ষীণ ভাবে প্রাণ ধারণ করিতেছিল। প্রেততত্ত্বের সবে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত উহা দ্বারা প্রকৃত পারলৌকিক সত্য আবিষ্কৃত হইবার আশা সুদূরপরাহত ছিল। ব্লাভাস্কীর সিদ্ধান্তানুসারে অদ্যাপি প্রেততাত্ত্বিকগণের দ্বারা প্রকৃত সত্য নিরূপিত হয় নাই। ইহা আমরা প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার মতালোচনায় দেখিতে পাইব। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বে পাশ্চাত্য দেশের এই যে অশ্রদ্ধা, অবিশ্বাস, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, একমাত্র প্রমাণাভাবাৎ এমন সময়ে ঐ তত্ত্বের সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমান প্রমাণ স্বরূপ ব্লাভাস্কীর উদয়। তাঁহার জীবনগত, প্রত্যক্ষ, স্থূলাতীত শক্তিমূলক ক্রিয়াকাণ্ড দর্শনে সহসা লোকের ভাবরাজ্যে এক বিপ্লবের সূচনা করিল। এই ভাব-বিপ্লবের ক্রিয়া ক্রমে ক্রমে কিরূপ সুদূর প্রসারিত হইয়াছিল,

এবং কালসহকারে পাশ্চাত্য ভাবাশ্রিত এ দেশীয় শিক্ষিত সমাজে কতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার ক্রমাভিব্যক্তি বুঝিতে হইলে ব্লাভাস্কীর প্রথম জীবনের কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ আবশ্যক। তিনি কখনও সভা সমিতিতে বক্তৃতা দ্বারা প্রচার করেন নাই, তাঁহার কোন গ্রন্থও তখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার জীবন দ্বারাই তত্ত্ব প্রচারিত হইতেছিল, তাঁহার অলৌকিক শক্তিতেই বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল, তাঁহার তদানীন্তন ক্রিয়া কাণ্ডেই সমাজের চিন্তা স্রোতে এক প্রবল আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতেছিল।

বলা বাহুল্য, অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন আর্য্য-শাস্ত্রের অনুমোদিত নহে। ইহা কখনই উচ্চ আধ্যাত্মিকতার নিদর্শন বলিয়া গৃহীত হয় নাই। তথাপি অজ্ঞানবিজৃম্ভিত মতবাদির উচ্ছেদ কল্পে মহাপুরুষগণ, এমন কি, অবতারগণ পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে অলৌকিক শক্তির আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ব্লাভাস্কী এদেশে আসিয়া অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন করাতে তাঁহাকে শাস্ত্রদর্শী আর্য্য সন্তানগণের নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। হিন্দুর লক্ষ্য মুক্তি। সাধন-পথে অতীন্দ্রিয় শক্তিলাভ কিছুই আশ্চর্য্য বা অসম্ভব নহে—ইহা এদেশের প্রমাণিত সত্য। এই পুরাণ-তন্ত্রের দেশে, ত্রিকালদর্শী ঋষি মুনির লীলাস্থলে, যোগী ধ্যানীর কর্ম্মক্ষেত্রে, অলৌকিকত্ব বুঝি প্রত্যেক পরমাণুতে অনুস্যূত। এদেশের ইতিহাসে, উপকথায়, জীবনে, আচরণে, স্বপ্নে, জাগরণে অতীন্দ্রিয় রহস্য কথা অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিজড়িত। গর্ভাধান হইতে শ্মশান শয্যা পর্য্যন্ত যাবতীয় অনুষ্ঠান জড়াতীত অধ্যাত্মতত্ত্বে অনুপ্রাণিত। সুতরাং পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় এ দেশের লোকে অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে বড় বিস্মিত হয় না। এবং বিস্মিত হইলেও উহাকে কোন উচ্চ অধিকার বা লোভনীয় বস্তু বলিয়া স্বীকার করে না। ইঁহারা মুক্তিপার্থী। সিদ্ধি মুক্তির পরিপন্থী, তাই সিদ্ধি হেয়। নিয়স্তরের সিদ্ধির ত কথাই নাই, করতলগত অণিমা লঘিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্যও আনন্দধাম-যাত্রীর ত্যজ্য। সাধন প্রভাবে ঐশ্বর্য্যলাভ সম্ভবপর, যথা উপনিষদুক্তি,

যং যমন্তমভিকামো ভবতি যং কামং কাময়তে সোঽস্য শঙ্কল্পাদেব সমুত্তিষ্ঠতি, তেন সম্পন্নো মহীয়তে। (ছা, উ। ৮। ২। ১০)

অর্থাৎ, সাধক যে বস্তু কামনা করেন, তাহা তদীয় সঙ্কল্প প্রভাবে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহা তীব্র সাধনার জ্ঞাপক সন্দেহ নাই, কিন্তু হীয়তেঽর্থাৎ য উ প্রেয়ো বৃণীতে। (ক উ। ১। ২। ৯) অর্থাৎ ভোগ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী পরম পুরুষার্থে বঞ্চিত হয়েন।

যাহারা 'প্রেয়' পাইয়া মুগ্ধ হইল, তাহাদের 'শ্রেয়' পথ সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ হইয়া গেল। তাই নিবৃত্তি-মূলক আর্য্য শাস্ত্রে সিদ্ধির হেয়ত্ব, এবং সিদ্ধিপ্রদর্শনকারীর ততোধিক হেয়ত্ব শতমুখে বিঘোষিত। সিদ্ধিলাভ সাধনোৎকর্ষের পরিচায়ক হইলেও, সুতরাং সিদ্ধির অধিকারী শ্রদ্ধার্হ হইলেও, সিদ্ধি প্রদর্শন জ্ঞানীর পক্ষে অনাচরণীয়। সেই জন্য এতদ্দেশীয় সাধক ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ব্লাভাস্কীর প্রতি কিঞ্চিৎ বিরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এই তাপসী অসীম শক্তিশালিনী, সন্দেহ নাই, কিন্তু ইনি স্বীয় যোগ শক্তি সাধারণ্যে প্রকাশ করেন কেন। সাধক ও পণ্ডিতগণ বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, যিনি সিদ্ধিকে আপন বশে রাখিয়া মানব হিতার্থে উহার সুব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে উক্ত নিয়ম প্রযুজ্য নহে। বোধ

হয় তাঁহারা ভাবেন নাই যে ব্লাভাস্কী কেবল নিজের নিঃশ্রেয়সের পথ পরিষ্কার করিতে আইসেন নাই। তিনি সমগ্র মানব জাতির সেবার জন্য আসিয়াছিলেন। তিনি জড়-বাদী, ইহ-সর্ব্বস্ব নাস্তিকদের মোহব্যাধির কালোচিত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মহৌষধি হস্তে আগমন করিয়াছিলেন। বিকারে বিষ প্রয়োগই ব্যবস্থা। তাই তিনি প্রত্যক্ষ-বাদীকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়া চিরন্তন সত্য পথে আনিবার জন্য সতত চেষ্টিত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি নিজের ইহপারলৌকিক মঙ্গলা-মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না। পরন্তু, তাঁহার মতে, স্বার্থশূন্য, তত্ত্বজ্ঞান বিস্তাররূপ মানব সেবাধর্ম্মেই ভূমানন্দের পথ উন্মুক্ত। তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শনের মূলে নিরবিল জনহিতৈষণা ও মহোচ্চ স্বার্থত্যাগ দেদীপ্যমান।

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর ক্রমবিকাশমান তাত্ত্বিক ইতিহাসের উপক্রমণিকাতেই ব্লভাস্কীর কার্য্য-প্রভাব অঙ্কিত দেখিতে পাই। সুতরাং কি প্রকারে তিনি তদানীন্তন পরকাল-চিন্তা-বিমুখ পাশ্চাত্য সমাজকে তত্ত্ব-রহস্যে আকৃষ্ট করিলেন, ইহা তাঁহার ক্রিয়া দৃষ্টে বুঝা আবশ্যক। তাঁহাদের গৃহে সমাজের নেতৃ-স্থানীয়, সম্ভ্রান্ত, ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন। সেই সুযোগে ব্লাভাস্কীর আধ্যাত্মিক প্রভাব ইঁহাদের ভিতর দিয়া প্রথমতঃ বিদ্বৎ সমাজ, এবং তৎপর ক্রমে প্রশস্ততর ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িল।

জেলিহোবাস্কী বলেন, ইস্তক নগরে বাস কালীন ব্লাভাস্কী যে সকল অদ্ভুত ক্রিয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহার একাংশও সবিস্তার বর্ণন করা অসম্ভব। কিন্তু সে গুলি সাধা-রণত নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত।

(১) মনোগত প্রশ্নের সঠিক উত্তর দান। ইহা চিন্তা-পাঠ শক্তির (Thought reading) অন্তর্ভুক্ত।

(২) বিভিন্ন রোগের লাটিন ভাষায় লিখিত ব্যবস্থা পত্র দান, ও তৎফলে রোগ মুক্তি।

(৩) গুপ্ত কথা প্রকাশ করা। এ সকল এমন গুপ্ত যে, কার্য্যের কর্ত্তা ভিন্ন সং-সারে আর কেহ জানিত না।

(৪) গৃহের কোন দ্রব্যের বা লোকের দৈহিক গুরুত্বের হ্রাস বৃদ্ধি করা।

(৫) অপরিচিত-হস্ত-লিখিত পত্র-প্রাপ্তি, এবং কোন ২ প্রশ্নের ঐ রূপ উত্তর প্রাপ্তি। এইরূপ পত্র ও প্রশ্নোত্তর-সম্বলিত কাগজ নিতান্ত অভাবিত স্থানে পাওয়া যাইত। দৃষ্টান্ত যথা,—লিয়োণ্টিন নাম্নী জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর সহিত দূরবাসী কোন যুবকের বিবাহের কথাবার্ত্তা হওয়ায় তিনি পাত্রের ভাগ্যাদি সম্বন্ধে জানিতে চাহেন। একদিন প্রয়োজন বশতঃ নিজের তালা-বন্ধ সিন্দুকের মধ্যস্থ একটী ক্ষুদ্র পেটিকা খুলিয়া দেখেন, উহার মধ্যে একখানি পত্র রহিয়াছে। সেই পত্রে যুবক সম্বন্ধীয় তাঁহার জ্ঞাতব্য সকল কথা লিখিত ছিল। যুবকের নামটী তিনি কস্মিনকালে ব্লাভাস্কীর নিকট প্রকাশ করেন নাই, কিন্তু পত্রে নামটীও পূর্ণভাবে লিখিত ছিল।

(৬) কখনও কখনও নূতন দ্রব্যের আবি-র্ভাব হইত। উহা কাহার জিনিষ, তাহা কেহই জানিতে পারিত না।

(৭) গৃহের যথা-তথা সপ্তস্বর-বিশিষ্ট সঙ্গীতের উৎপত্তি।

আত্মীয় স্বজনেরা ব্লাভাস্কীর ক্ষমতায় বড় একটা বিশ্বাস করিতেন না। বরং তাঁহাদের

অবিশ্বাস ও উপেক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ছিল। তাঁহাদের সেদিনকার হেলেনার আবার এত শক্তি, একথা বিশ্বাস করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক নহেন। স্নেহ-রাজ্যের ইহা একটী সাধারণ নিয়ম। পিতামাতা বাৎসল্যের কোমল মাধুর্য্যে মুগ্ধ, তাঁহারা তাঁহাদের স্নেহের বস্তুতে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের আরোপ করিতে বা উহার শক্তিমত্তার কার্য্য দেখিতে লালায়িত নহেন। পুরাণে বর্ণিত আছে, মাতা যশোদা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তিমত্তার বহুদৃষ্টান্ত সত্ত্বেও তাঁহাকে সেই অবোধ গোপাল ভিন্ন অন্য কিছু ভাবিতে পারিতেন না। ভাবতে ক্লাইবের অসাধারণ কৃতকার্য্যতার কথা শুনিয়া তাঁহার পিতা বলিয়াছিলেন,—"after all,the booby has sense' —অর্থাৎ "যা হ'ক এ বোকা ছেলের কিঞ্চিৎ বুদ্ধি আছে।" পিতার সেই স্নেহানুরঞ্জিত অবোধ-বালক-ক্লাইব-ভাবটী তখনও তাহার মনে বদ্ধমূল রহিয়াছে।

ব্লাভাস্কীর ভ্রাতা লিয়োনিদ ও পিতা মহাশয় বহুকাল পর্য্যন্ত এই সকল অলৌকিক ক্রিয়ার কোন প্রমাণ স্বীকার করিলেন না। শেষে নিম্নলিখিত ঘটনায় লিয়োনিদের সংশয় দূরীভূত হইল। বাটীর অভ্যর্থনা-গৃহটী সমাগত ব্যক্তিগণে পূর্ণ। কেহ গান করিতেছেন, কেহ তাস খেলিতেছেন। কিন্তু অনেকেই অলৌকিক ব্যাপার লইয়া মত্ত। লিয়োনিদ হ্যান্ নিজে 'কোন' কার্য্যে যোগ না দিয়া একাকী পাদচারণা করিতেছেন, এবং সকলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বেড়াইতেছেন। লিয়োনিদ বলিষ্ঠ দৃঢ়কায় যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায় সুপণ্ডিত, লাটীন ও জর্ম্মান ভাষায় পারদর্শী,—তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করেন না, কিছুতেই আস্থাবান নহেন। ভগ্নীর আসনের পশ্চাদ্ভাগে লিয়োনিদ আস্তে আস্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ব্লাভাস্কী গল্প করিতেছিলেন যে, মাধ্যমিক* শক্তি-সম্পন্ন লোকেরা অনায়াসে লঘু বস্তুকে এত ভারি করিতে পারে যে, উহা উত্তোলন করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, আবার মহাভারী বস্তুকেও অনায়াসে লঘু করিতে পারে। লিয়োনিদ একমনে এই সব বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা শুনিতেছিলেন। শেষে ব্যঙ্গস্বরে ভগ্নীকে জিজ্ঞাস করিলেন,—

* মিডিয়ম (medium) কথাটার অনুবাদে কেহ কেহ বাঙ্গালায় মধ্যস্থ শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। উপযুক্ত প্রতিশব্দের অভাবে মূল মিডিয়ম শব্দও অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাহিত্য-রথী স্বর্গীয় কালী প্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় 'মিডিয়ম' অর্থে 'মাধ্যমিক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা এস্থলে মাধ্যমিক শব্দটী গ্রহণ করিলাম। ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"মিডিয়ম শব্দ যেমন ইংরাজীতে নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, মাধ্যমিক শব্দও সেইরূপ বাঙ্গালায় নূতন অর্থে ব্যবহৃত হইল। অর্থ এই—যাঁহারা জড় ও অজড়, অথবা দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যস্থলে সেতু স্বরূপ,—অর্থাৎ যাহাদিগের শরীর-নিহিত তথাবিধ বিশেষ শক্তির আশ্রয় লইয়া সূক্ষ্মশরীরি আত্মিকেরা জড়জগতে প্রবেশ ও জড়বস্তুর উপর কার্য্য করিতে পারেন, তাহারাই মিডিয়ম অথবা মাধ্যমিক। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাও বহু পরীক্ষাদ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, এই মাধ্যমিকী শক্তি সমস্ত নরনারীর শরীরেই অল্প পরিমাণে বিদ্যমান আছে। উহা যত্নে বাড়ে, অযত্নে নষ্ট হয়,—একজনের শরীর হইতে আর একজনের শরীরে সঞ্চারিত হইতে পারে, এবং দশজন একত্র হইয়া নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চেষ্টা করিলে, বিশেষরূপে বিকশিত হইয়া থাকে। ...বিদ্যুৎ যেমন চিরন্তন পদার্থ, মাধ্যমিক শক্তিও সেইরূপ চিরন্তন পদার্থ। বিদ্যুতের শক্তি অল্পদিন হইল আবিষ্কৃত হইয়া, মনুষ্য-জগতের প্রয়োজন সাধক হইয়াছে। মাধ্যমিক শক্তিও সেইরূপ অল্পদিবস হয় আবিষ্কৃত হইয়া পারলৌকিক জগতের জ্ঞানলাভে, মনুষ্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছে।" "জানকীর অগ্নি-পরীক্ষা"

'তোমার বলিবার অভিপ্রায় বোধ হয় যে, তুমি নিজেও এসব করিতে পার ?'

ব্লাভাস্কী ধীরভাবে উত্তর করিলেন,—'শক্তিমান ব্যক্তিরাই পারেন। আমিও কখন কখন করিয়াছি বটে। তবে সর্ব্বদাই সফল হইব, এরূপ বলিতে পারি না।'

একজন তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন,—'কিন্তু আপনি একবার চেষ্টা করুন না।' অপর সকলে এই অনুরোধে তৎক্ষণাৎ যোগ দিলেন। ব্লাভাস্কী একটী ক্ষুদ্র শতরঞ্চ ক্রীড়ার টেবিল লইয়া পরীক্ষা করিতে সম্মত হইয়া বলিলেন, 'যাঁহার ইচ্ছা এখন একবার টেবিলটী উঠাইয়া দেখিয়া লউন, তার পর আমি উহা স্থাপিত করিলে আবার তুলিতে চেষ্টা করিবেন।'

এই কথা শুনিয়া একজন বলিলেন,—'আপনি টেবিলটী স্থাপিত করিবেন, বলিলেন। ইহার অর্থ কি ? উহা হাত দিয়া ধরিয়া রাখিবেন না ত ?' ব্লাভাস্কী বলিলেন, 'টেবিল আমি স্পর্শও করিব না।'

এই অদ্ভুত কথা শুনিয়া জনৈক যুবক দৃঢ় সঙ্কল্পসহকারে অগ্রসর হইয়া টেবিলটীকে একখানি পালকের ন্যায় অনায়াসে উত্তোলিত করিলেন। পুনরায় উহা নিম্নে স্থাপিত হইলে ব্লাভাস্কী একান্ত সাগ্রহ দৃষ্টিতে টেবিলটী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে দৃষ্টি অন্তরিত না করিয়াই ইঙ্গিতে যুবককে টেবিল স্থানান্তরিত করিতে আহ্বান করিলেন। যুবক অগ্রসর হইলেন এবং টেবিলের একটী পা ধরিয়া তুলিতে গেলেন। পূর্ব্বের ন্যায় অনায়াসে তুলিয়া ফেলিবেন, ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না, কিন্তু টেবিল নড়িল না। তিনি দুই হস্তে উহা টানিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু টেবিল যেন লৌহশলাকা দ্বারা ভূমিতে সংবদ্ধ একটুও স্থানচ্যুত হইল না। যুবকের প্রাণপণ শক্তি ব্যর্থ হইল। দর্শকমণ্ডলী সবিস্ময়ে উচ্চকণ্ঠে সাধুবাদ করিয়া উঠিল।

কিন্তু লিয়োনিদের মনে সন্দেহ হইল, যুবক বুঝি ভগ্নীর সঙ্গে পূর্ব্বে পরামর্শ করিয়া সকলকে প্রতারিত করিলেন। তাই তিনি নিজে একবার পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক হইলেন। ব্লাভাস্কীর অনুমতি পাইয়া লিয়োনিদ অগ্রসর হইলেন, এবং হাস্য করিতে করিতে স্বীয় অতুল বল বিশিষ্ট বাহু দ্বারা ক্ষুদ্র টেবিলের একটা পা সজোরে ধরিয়া উহা একেবারে তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন। সে হাস্য কোথায় অন্তর্হিত হইল—তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বদনমণ্ডলে এক নীরব বিস্ময়ব্যঞ্জক ভাব চিত্রিত হইল। একটু পশ্চাৎ সরিয়া গিয়া পুনরায় পরীক্ষান্তে টেবিলের পার্শ্বে এক প্রচণ্ড পদাঘাত করিলেন, কিন্তু উহা একটুও হেলিল না। এবার লিয়োনিদ ছুটিয়া গিয়া টেবিলের উপরিভাগে অসীম বলাধার স্বীয় বক্ষস্থল অবস্থাপিত করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা উহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক ভীষণ বলে উহা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। টেবিলের কাষ্ঠ কড় কড় করিতে লাগিল, ফাটিয়াও গেল, কিন্তু উহা একটুও নড়িল না। লিয়োনিদ কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব ভাবিয়া গৃহের এক পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিস্ময়-গভীর নেত্রে ভগ্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল কহিলেন,—'কি আশ্চর্য্য!

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার লইয়া গৃহ মধ্যে মহা বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। তর্কবিতর্ক উচ্চরবে আকৃষ্ট হইয়া অপর গৃহ হইতে অনেক লোক আসিয়া একত্রিত হইল, এবং যুবা বৃদ্ধ

সকলেই টেবিলটী নাড়াইতে কত চেষ্টা করিল, কিন্তু সবই নিষ্ফল হইল। সেই ক্ষুদ্র টেবিলটীর নিকট সকলের বলবত্তা, শক্তিসামর্থ্য পরাভূত হইয়া গেল।

ভ্রাতার স্তম্ভিত ভাব দেখিয়া ব্লাভাস্কী তাঁহার সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বভাবোচিত হাস্য মুখে তাঁহাকে টেবিলটী তুলিতে অনুমতি করিলেন। এবার লিয়োনিদ স্পর্শ করিবা মাত্র টেবিল একখানি পালকের ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে ব্লাভাস্কী ও তাঁহার ভগ্নী পিতার সহিত ইস্কফ পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী পিতরবর্গে আইসেন। একটী 'হোটেলে' ইঁহাদের বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট হয়। সাংসারিক নানা কার্য্যে দুই ভগ্নীর পূর্ব্বাহ্ন কাটিয়া যাইত, অপরাহ্নে বাটীতে কেহ আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনায় ইঁহারা নিযুক্ত থাকিতেন, নয়ত বন্ধু বান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বহির্গত হইতেন। অলৌকিক ক্রিয়ার নামটী করিবার তখন অবকাশ ছিল না। এমন সময়ে এক দিন কর্ণেল হ্যানের দুইটী পুরাতন বন্ধু আসিলেন। উভয়েই বৃদ্ধ। তন্মধ্যে একজন কর্ণেল হ্যানের সহপাঠী ছিলেন। উভয়েরই নবপ্রচারিত প্রেততত্ত্বে বিলক্ষণ আগ্রহ। সুতরাং উভয়ই চাক্ষুষ কিছু দেখিতে একান্ত ইচ্ছুক হইলেন। ব্লাভাস্কীর কয়েকটী ক্রিয়া সচক্ষে দেখিয়া ইঁহারা যুগপৎ আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বন্ধুকন্যার অদ্ভুত শক্তির কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া ইঁহারা কিছুই কূল কিনারা পাইলেন না। আর তাঁহার পিতা সর্ব্বদা এই সব ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া কিরূপে এমন উপেক্ষার ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছেন, ইহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না।

জেলিহোবাস্কী পিতৃ-চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"আমার যে পরিবারে জন্ম হয়, উহা চিরকালই প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানে অনুরক্ত ও সরল ধর্ম্মপ্রাণ, কিন্তু কখনও অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-রহস্যে বিশ্বাসবান ছিল না। আমাদের পরিবারস্থ লোকেরা কোন অলৌকিক তত্ত্ব বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিত না বটে, কিন্তু তাই বলিয়া প্রকৃতির যাহা কিছু অজ্ঞাত, তাহাই যে কার্য্যকারণ-ন্যায়ে অসম্ভব বা অসঙ্গত হইতেই হইবে, এরূপ অন্যায় সংস্কারও তাঁহাদের ছিল না। আর তাঁহারা কখনও কোন বিষয় নিজের বোধগম্য নয় বলিয়াই হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন না। বোধ হয়, ইহা সকলেই জানেন যে, শিক্ষিতাভিমানী মার্জ্জিত-রুচি ব্যক্তিগণ কখনও স্বীয় মনের বা বুদ্ধির দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিতে চাহেন না, এবং এই হেতু সকল বিষয়েই তাঁহারা প্রথমতঃ একটা অবিশ্বাস বা উপহাসের ভান করিয়া থাকেন। আমাদের পরিবার মধ্যে এরূপ কোন ভাব ছিল না। আবার অতীন্দ্রিয় বস্তুতে বিশ্বাস জন্মাইবার সাধারণতঃ যে দুইটী প্রধান কারণ, অর্থাৎ বদ্ধমূল কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস—তাহাও আমাদের পরিবারে কখনও স্থান পায় নাই। মাতার মৃত্যুর পর হইতেই আমি মাতুলালয়ে লালিত পালিত হই। ষোল বৎসর বয়সের সময় মাতুল পরিবার ত্যাগ করিয়া পিতৃ গৃহে বাস করিবার জন্য আসি। তখন দেখিলাম, পিতা মহাশয় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়া গিয়াছেন। তিনি তখন ঘোর অবিশ্বাসী, প্রত্যক্ষবাদী। ঈশ্বর মানিতেন বটে, কিন্তু কোন ধর্ম্ম গ্রন্থকেই ঈশ্বর-বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না এবং কার্য্যেও তদনুরূপ আচরণ করিতেন। তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধির উচ্চদরের

ছিল; এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাঁহার প্রচুর ব্যুৎপত্তি ছিল। আর তিনি জীবনে ভূয়োদর্শন-জনিত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যত শিক্ষা, যত জ্ঞান, যত বহুজ্ঞতা, সমস্তই একমাত্র স্বমতের পরিপোষণে প্রযুক্ত হইত। ফলে এই দাঁড়াইয়াছিল যে,খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্ত্বকে শিরোধার্য্য করা দূরে থাকুক, তিনি উহা একেবারেই অগ্রাহ্য করিতেন, এবং জীবাত্মার অমরত্ব ও পরলোক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

কর্ণেল হ্যানের যে অবস্থা তাঁহার কন্যার মুখে বর্ণিত হইল, ইয়ুরোপে তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের সর্ব্বত্রই প্রায় সেই অবস্থা। যাহা হউক, সমাগত বন্ধুদ্বয় কর্ণেল মহাশয়কে পূর্ব্বোক্ত রূপ অনুযোগ করায় তিনি বলিলেন, 'আমি ঐ সকল মূর্খোচিত কার্য্যের মধ্যে থাকি না।' বন্ধুদ্বয় অন্ততঃ তাহাদের বন্ধুত্বের অনুরোধে একবার তাঁহাকে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিলেন। কর্ণেল হ্যান আজ তাঁহাদিগকে খুব বোকা বানাইয়া বিদ্রূপ করিবেন,—এই আশায় অবশেষে পরীক্ষায় সম্মত হইলেন। তিনি তাস খেলিতেছিলেন, খেলা ছাড়িয়া পার্শ্বের ঘরে গিয়া একখণ্ড কাগজে একটী শব্দ লিখিয়া নিজের পকেটে খুব সাবধানে কাগজখানা লুকাইয়া রাখিলেন। তৎপর, আবার ক্রীড়াস্থলে আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় শুভ্র শ্মশ্রুর অন্তরালে হাস্য করিতে করিতে ফলাফল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুপ্ত কথাটী ব্লাভাস্কী শব্দদ্বারা প্রকাশ করিতে পারেন কিনা,—ইহা'ই ছিল পরীক্ষার বিষয়। কর্ণেল হ্যান বন্ধুদিগকে বলিলেন,—'আমাকে যে দিন তোমরা এই সব ভূতুড়ে কাণ্ডে বিশ্বাস করাইতে পারিবে, আমি সেই দিন হইতে তোমাদের কুসংস্কার ভাণ্ডারে যাহা কিছু সামগ্রী আছে,সবই মানিতে আরম্ভ করিব, আর তোমরাও তখন আমাকে স্বচ্ছন্দে একটা পাগলা গারদে পাঠাইয়া দিতে পারিবে।" এই কথা বলিয়া পুনরায় খেলায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দার্শনিক ভল্‌তেয়ার ( Voltaire ) মতাবলম্বী প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন।

এদিকে শব্দ দ্বারা একটী কথা প্রকাশিত হইল। কিন্তু কথাটী এত নূতন ও অসম্ভাবিত যে কর্ণেল হ্যানের লক্ষ্যভূত বা লিখিত বিষয়ের সহিত ইহার কোন সংশ্রব আছে,ইহা কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সেইজন্য উহা ঠিক কিনা, জানিবার জন্য আবার প্রশ্ন করা হইল। তদুত্তরে পুনঃ পুনঃ হাঁ সূচক শব্দ হইতে লাগিল। কর্ণেল হ্যান গোলযোগ দেখিয়া বন্ধুদ্বয়কে শিক্ষা বিদায় উপযুক্ত সুযোগ উপস্থিত ভাবিয়া জিজ্ঞাসিলেন, ব্যাপার খানা কি? উত্তরে, তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে বলা হইল, একটী অপ্রত্যাশিত শব্দ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তিনি আমোদ ও উপেক্ষার ভাবে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কথাটা কি?' উত্তর হইল,'জেইচিক্।' কন্যার মুখ হইতে এই শব্দটী নির্গত হইবা মাত্র বৃদ্ধের মুখের ভাব একেবারে রূপান্তরিত হইয়া গেল। ইহা সকলেই লক্ষ্য করিলেন। কম্পিত করে চশমাটী নাসিকাগ্রে স্থাপিত করিয়া কন্যার হস্ত হইতে কাগজখানি লইয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে পাঠ করিলেন;—'জেইচিক্'। তার পর পকেট হইতে নিজের লিখিত কাগজ খণ্ড বাহির করিয়া নীরবে উপস্থিত ভদ্রলোকদের হস্তে প্রদান করিলেন। কাগজে লিখিত ছিল,—'প্রথম তুরস্ক সমরে আমার যে প্রিয় অশ্বটী আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলাম, উহার নাম কি?' এই প্রশ্নের নিম্নেই বন্ধুদ্বয়

চিহ্নের অভ্যন্তরে উত্তর স্বরূপ লিখিত ছিল,—'জেইচিক্'। রুষভাষায় জেইচিক অর্থে ক্ষুদ্র মৃগ বিশেষ। অশ্বটীকে উক্ত নামে ডাকা হইত।

যাহারা কিছুই মানে না, তাহাদের কোন বিষয়ে একবার প্রত্যয় জন্মিলে প্রায় দেখা যায় যে,ঘোর অবিশ্বাস প্রগাঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। কর্ণেল হ্যানের তাহাই হইল। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন, ব্লাভাস্কীর কার্য্য মূলে কোনরূপ ছল, চাতুরী বা প্রবঞ্চনার লেশ মাত্র নাই, তখন তিনি প্রবল আগ্রহের সহিত অলৌকিক রহস্যরাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

মুসলমানদিগের সহিত যখন খ্রীষ্টীয় জাতি-সমূহের প্রথম ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই দুর্দ্দিনের ঘোর বিপ্লবে হ্যান-গোষ্ঠীর বংশ-বিবরণটী বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কর্ণেল হ্যানের ইচ্ছা হইল, ব্লাভাস্কীর সাহায্যে ধারাবাহিকরূপে স্বীয় পারিবারিক ইতিহাসের পুনরুদ্ধার করা। ব্লাভাস্কী পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হ্যান বংশের আদি পুরুষের নাম কাউণ্ট ভন্ রনস্তাবন। তিনি মহা শৌর্য্যশালী ধর্ম্মযোদ্ধা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। কথিত আছে, পেলেস্তিনে ( Palestine ) মুসলমানদিগের ( Saracens ) সহিত ধর্ম্মযুদ্ধকালে রতনস্তাবনকে নিদ্রিতাবস্থায় বধ করিবার জন্য শত্রু পক্ষীয় একজন সৈন্য তাহার শিবিরে প্রবিষ্ট হয়। এমন সময়ে হঠাৎ একটী কুক্কুটীর চীৎকারে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়; এবং তিনি শিবির-প্রবিষ্ট সেই আততায়ীকে দেখিতে পাইয়া উহার বিনাশ সাধন করেন। তিনি কৃতজ্ঞতা-প্রণোদিত হইয়া স্বীয় বর্ম্মোপরি কুক্কুটীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন। তদবধি তিনি রতনস্তাবন ভন্ হ্যান (জর্ম্মন ভাষায় কুক্কুটীকে হ্যান্—Hahn- বলে ) বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন, এবং তদীয় বংশাবলী হ্যান্ আখ্যা প্রাপ্ত হইল। এই আদিপুরুষ হইতে কর্ণেল হ্যানের সময় পর্য্যন্ত বংশাবলীর আমূল বৃত্তান্ত উদ্ধার করিতে হইবে। কি দুঃসাধ্য অমানুষিক কার্য্য! কর্ণেল হ্যান এতদর্থে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। ব্লাভাস্কীর পরিচালনায় 'শব্দ' চলিতে লাগিল, এবং তদ্দ্বারা তিনি সুদূর অতীতযুগ-সংঘটিত রাশি রাশি ঘটনার বর্ষ, মাস, দিন, তারিখ, এবং বংশের আদিপুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোকের জন্মকাল, নাম ও প্রত্যেকের সমসাময়িক ইতিবৃত্ত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তড়িৎ গতিতে, বিবৃত করিয়া দিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাঁহার ভগ্নী বলিতেছেনঃ—'জগতে এমন কোন্ মহান্ ঐতিহাসিক আছেন, যাঁহার ঈদৃশ অমানুষিক স্মৃতি শক্তি, এমন অশ্রুতপূর্ব্ব ধৃতিক্ষমতা যে তিনি এ হেন বিরাট কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ? তবে কোন্ শক্তি বলে ব্লাভাস্কী আজ সংখ্যাশাস্ত্রে, বাল্যাবধি নিতান্ত অজ্ঞ হইয়াও, ইতিহাসে কিছু মাত্র জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও,—কোন্ শক্তিবলে এমন অসম্ভব কার্য্য অনায়াসে সুসম্পন্ন করিলেন? তবে কি ইহা একটা বিরাট প্রতারণা মাত্র? অসম্ভব। সংখ্যাশাস্ত্রে ও ইতিহাসে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও তিনি অসংখ্য ঘটনার সময় ও লোকের জন্মকালাদি নিরূপণ পক্ষে সুদীর্ঘ গণনা-সাপেক্ষ সময়ের পূর্ব্বাপরতা স্থিরীকরণ সম্বন্ধে যে অপূর্ব্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, প্রতারণাবাদ মানিলেও সেরূপ অমানুষিক দক্ষতা কাহারও পক্ষে, বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় স্বল্প-শিক্ষিতা রমণীর পক্ষে,কখনও সম্ভবপর নহে। তদ্বর্ণিত যে সকল ঘটনার সত্যাসত্য অনুসন্ধান দ্বারা নিরূপিত হইবার সম্ভা-

বলা ছিল, অতঃপর উপযুক্ত পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হয় যে, সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সত্য ও যথাযথ। ব্লাভাস্কীর প্রকাশিত সামান্য ঘটনাটী ও তন্নির্ণীত অতিসূক্ষ্ম সময়টীও প্রামাণ্য ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে একটু বিভিন্ন হয় নাই। রুষ-রাজ তৃতীয় পিতরের (Peter III) সময় হইতে এই বংশীয় যে সকল ব্যক্তি জর্ম্মনী হইতে রুষিয়ায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ-তালিকা অনেক স্থলেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তখনও উভয় দেশেই হ্যান বংশীয় কোন কোন পরিবারে বংশানুচরিত সম্বন্ধীয় লুপ্তাবশিষ্ট কিছু কিছু কাগজপত্র সযত্নে রক্ষিত ছিল। সেই সকল কাগজ যখনই পাঠ করা হইত, তখনই বোধ হইত যেন ব্লাভাস্কীর শব্দ প্রকাশিত বৃত্তান্তগুলি উহারই প্রতিলিপি মাত্র।'

গৃহ প্রত্যাগমনের কিয়ৎকাল পরে ব্লাভাস্কী পিতার সহিত ভগ্নীর জমীদারীভুক্ত একটী পল্লীবাটীতে কিছুদিন বাস করেন। ভগ্নীও সঙ্গে ছিলেন। এই সময় একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। পল্লীর অনতিদূরে একব্যক্তি হত হয়। হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। তজ্জন্য জেলা পুলিশের অধ্যক্ষ স্বয়ং অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইয়া একদিন উক্ত পল্লীবাটীতে উপস্থিত হয়েন। পুলিশের উদ্দেশ্য গোপনানুসন্ধান। পুলিশকর্ম্মচারী জেলিহোবাস্কী পরিবারের পূর্ব্ব পরিচিত। তিনি মফঃস্বল পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইলে প্রায়ই ইঁহাদের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। তাই তাঁহার আগমনের বিশেষ কোন কারণ ছিল কিনা, সে বিষয়ে কেহই তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করে নাই। তিনিও কাহাকে কিছু বলিলেন না। কিন্তু পরদিবস যখন তিনি কতকগুলি গ্রাম্য প্রজাকে ডাকাইয়া তাহাদের 'এজাহার' লইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হইল। এজাহারে কোন ফলই হইল না।

কর্ণেল হ্যান পুলিশাধ্যক্ষকে হতাশ দেখিয়া বলিলেন,—'আপনি একবার আমার এই কন্যার অদৃশ্য অনুচরদিগের সাহায্যে হত্যাকারীর নাম ধামাদি জানিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন কি?' পুলিশ-প্রভু উপহাস করিয়া বলিলেন,—'আমি ও সব সর্ব্বজ্ঞ ভূত প্রেতাদির সম্বন্ধে বেশ জানি। ঐ সব শৃঙ্গ-লাঙ্গলধারী মহাত্মারা যদি এ হত্যাকাণ্ডের কিনারা করিয়া দিতে পারেন, তবে আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই হারিতে প্রস্তুত আছি। নরহন্তারা ত এই সকল মহাত্মার দলের লোক! তাহারা কি আর নিজের লোকের বিরুদ্ধে কিছু বলিবে?' ব্লাভাস্কী এই তত্ত্বানভিজ্ঞ অথচ বাচাল লোকটীকে একটু শিক্ষা দিতে মনস্থ করিয়া বলিলেন—'দেখুন, কাপ্তান, আমি এরূপ কলুষিত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না, গুপ্ত পুলিশের সহায়তা করিতেও ব্যস্ত নহি। কিন্তু আপনার ধারণা যে মিথ্যা, ইহা সপ্রমাণ করিব। এক্ষণই শব্দ দ্বারা যাহা যাহা উক্ত হইবে, পিতা মহাশয় তদর্থবাচক বর্ণগুলি আপনাকে বলিয়া দিবেন, আপনি উহা নিজেই লিখিয়া লউন। আমার এখানে থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি বলেন ত আমি এ গৃহ হইতে চলিয়া যাই।' এই বলিয়া ব্লাভাস্কী গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। কর্ণেল হ্যান শব্দসূচিত বর্ণ গুলি বলিয়া যাইতে লাগিলেন। তথ্য মিলিল, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-প্রভুর গুণপনাও কিঞ্চিৎ ব্যক্ত হইল। জানা গেল যে, তিনি যখন অমুক স্থলে খোস্‌গল্প করিয়া সময় কর্ত্তন করিতেছিলেন,

সেই অবসরে হত্যাকারী পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া অন্য জেলায় চলিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি হত্যাকারী অমুক গ্রামে অমুক কৃষকের খড়ের ঘরে লুক্কায়িত আছে। পুলিশ যদি এই দণ্ডেই যাত্রা করে, তবে আসামীকে ধরিতে পারিবে। পুলিশাধ্যক্ষ চমকিত হইয়া কিরূপে ইহা জানা গেল, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সুস্পষ্ট উত্তর আসিল,—'তুমি তোমার নাকের কাছে যাহা আছে, তাহা ছাড়া অন্য কিছুই জান না। আমাদের অজ্ঞাত বস্তুও জানিবার উপায় আছে। হত্যাকারী জনৈক বিদায়-প্রাপ্ত সৈনিক। সে মদ্য পান-জনিত মত্তাবস্থায় এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছে। ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র, পূর্ব্বসংকল্পিত নহে, সুতরাং অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।'

পুলিশাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ শকটারোহণে ত্রিশ-মাইল দূরবর্ত্তী শব্দ-নির্দ্দিষ্ট গ্রামাভিমুখে ধাবিত হইলেন। পর দিবস তৎপ্রেরিত একজন অশ্বারোহী একখানা পত্র আনিয়া কর্ণেল হ্যানের হস্তে দিল। তাহাতে জানা গেল, হত্যাকারী শব্দ-নির্দ্দিষ্ট স্থানে ধৃত হইয়াছে, এবং সেই অপ্রাকৃত উপায়ে প্রকাশিত অন্যান্য তথ্য বর্ণে বর্ণে লিখিয়াছে।

এই ঘটনা লইয়া জেলা মধ্যে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, এমন কি, একটু গোলযোগেরও উৎপত্তি হইল। রাজধানী হইতে পুলিশ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে চাহিলেন যে, তিনি দেশদেশান্তরে সুদীর্ঘ পর্য্যটনের পর সে দিন মাত্র রুশীয়াতে আসিলেন, তিনি কি রূপে এই হত্যাকাণ্ড আমূল বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোক,—তাঁহার এ সকল জানিবার উপায় কি?' কর্ণেল হ্যানকে এই বিভ্রাট মিটাইতে একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে বুঝাইয়া দিলেন যে, হত্যাব্যাপারে তাঁহাদের কোন সংস্রব ছিল, এরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। পুলিশ কাহারও অলৌকিক শক্তিকে বিশ্বাস না করিতে পারে, কিন্তু কার্য্যটী অলৌকিক উপায়েই সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের কোন মন্দাভিপ্রায় ছিল না।

সমভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের সম্মিলন ক্ষেত্রে অলৌকিক অনুষ্ঠানের ফল কদাপি সত্য-বিরুদ্ধ হইত না, কিন্তু বিসদৃশ-ভাবাপন্ন বহু লোকের সমাগমে ফল অনেক সময়ে বিপরীত হইত। বিশেষতঃ যে সকল নিষ্কর্ম্মা লোক সত্যানুসন্ধানার্থ না আসিয়া কেবলই কুট পরীক্ষা ও কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আসিত, অনেক সময়ে ব্লাভাস্কীর উপেক্ষা হেতু তাহাদের বেলায় ফল মোটেই সন্তোষজনক হইত না। ইহাতে অবশ্যই তাহারা বড় প্রীত হইত না, অধিকন্তু ব্লাভাস্কীর প্রতি অযথা অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করিত।

একদা ইঁহাদের গৃহে একটী বিরাট সান্ধ্য-সমিতির অনুষ্ঠান হয়। এতদুপলক্ষে বহু লোকের সমাগম হয়। এমন কি, শত শত ক্রোশ দূর হইতেও অনেক ভদ্রলোক সপরিবারে কেবল ব্লাভাস্কীর অদ্ভুত ক্রিয়া কাণ্ড স্বচক্ষে কিছু দেখিতে পাইবেন বলিয়া উক্ত সান্ধ্য-সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় উপরোক্ত কারণবশতঃ এবং ব্লাভাস্কীর অনিচ্ছাক্রমে সে দিন ফলে কিছুই হইল না। ইহাতে নিমন্ত্রিতেরা ক্ষুণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, তাঁহারাও বাহির হইলেন, আর অমনি গৃহ মধ্যে আবার সজীবতার লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইল। গৃহের সামান্য বস্তুটী পর্য্যন্ত যেন মুখরিত হইয়া উঠিল।

জেলিহোবাস্কী বলিতেছেন,—'সে রাত্রির অধিকাংশই আমরা এমন ভাবে কাটাইলাম যেন কোন-ঐন্দ্রজালিক প্রাসাদের কুহকময় প্রাচীরাভ্যন্তরে থাকিয়া জাগ্রত স্বপ্ন দেখিতেছি। আমাদের স্মৃতি-পটে চিরাঙ্কিত সেই রজনীতে কত প্রকার ঘটনাই ঘটিয়া গেল! বস্তুতঃ সে রাত্রে যাহা ঘটে নাই, বরং তাহার সংখ্যা করা যায়, কিন্তু যাহা যাহা ঘটিয়াছিল,তাহার সংখ্যা হয় না। একাল পর্য্যন্ত আমরা যত রকম অদ্ভুত ক্রিয়া দেখিয়াছি, সে সকলই যেন আমাদের শিক্ষাকল্পে পুনরাবৃত্ত হইল। আমরা সকলে ভোজনে বসিয়াছি, আর অমনি পার্শ্বের কক্ষে পিয়ানো যন্ত্রটীতে নানা রাগরাগিণী বাজিয়া উঠিল। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, বাদ্য যন্ত্রটী আবৃত ও তালাবদ্ধ রহিয়াছে, অথচ উহা হইতে বিশুদ্ধ সঙ্গীত-স্রোত উত্থিত হইতেছিল। আমরা যন্ত্রটীর কাছে গিয়া দেখিলাম, উহা পূর্ব্ববৎ তালাবদ্ধ কিন্তু সঙ্গীতের শেষ মূর্চ্ছনাটী তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। তারপর, ব্লাভাস্কীর আদেশ মাত্র তাঁহার তাম্রকুটাধার, দেশলায়ের বাক্স, পকেট রুমাল প্রভৃতি কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া তাঁহার নিকট পতিত হইল। শুধু তাহাই নহে, তিনি যাহাই চাহিলেন, তাহাই ঐ রূপ উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। আর এক কাণ্ড! সহসা গৃহের আলোকগুলি নিবিয়া গেল; তৎক্ষণাৎ দীপ জ্বালাইয়া দেখা গেল, গৃহের যত ভারী ভারী সামগ্রী, অর্থাৎ শয্যা, আসন চৌকি, টেবিল,আলমারা প্রভৃতি, সমস্ত একেবারে উলটাইয়া গিয়াছে। যেন কাহার অদৃশ্য হস্ত নীরবে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই কার্য্য করিয়া ফেলিল; অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় একটী দ্রব্যও নষ্ট হয় নাই, এমন কি, কাচের দ্রব্যেও কিঞ্চিন্মাত্র আঘাত লাগে নাই। এই বিস্ময়াবহ ব্যাপারে আমাদের মতি বুদ্ধি বড় উদ্ভ্রান্ত হইয়া গেল।' ইত্যাদি।

বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অতিক ঘটনার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পর অধ্যায়ে এই সকল অলৌকিক ব্যাপারের মূলতত্ত্ব ও তৎ সম্বন্ধে ব্লাভাস্কীর নিজের মতামত অনুসন্ধান-প্রয়াসী পাঠকের অবগতির জন্য সংক্ষেপে বর্ণিত হইবে।

শ্রীদুর্গানাথ ঘোষ।

# বর্ণতত্ত্ব।†

## উদ্দেশ্য।

বর্ণতত্ত্ব শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বিবিধ মানবের সাদৃশ্য দৃষ্টে শ্রেণীবিভাগ করা এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ নির্ণয়; তৎপর তাহাদের আকৃতিগত এবং আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানগত সাদৃশ্য ও বৈষম্যের হেতু নির্দ্দেশ করা। সুতরাং ইহা মানবতত্ত্বের একাংশ।

## শ্রেণীবিভাগ।

পৃথিবীতে যতপ্রকার মানব আছে, তাহাদিগের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য ও বৈষম্য সহ-

† Ethinology—জীবতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত বি, এ, ল, চৌধুরী মহাশয়ের পরিভাষা এস্থলে গ্রহণ করিলাম। আমি নিজে 'জাতিতত্ত্ব' শব্দই ভাল বিবেচনা করি।

জেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কোন কোনটী বিশেষ অনুধাবন না করিলে বুঝা যায় না। তৃতীয় শ্রেণীর সাদৃশ্য ও বৈষম্য এত দুর্ব্বোধ যে, সে সকল যন্ত্র সাহায্যে আবিষ্কার করা ভিন্ন উপলব্ধি হয় না। এই সকল সাদৃশ্য ও বৈষম্য দৃষ্টে মানবগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কিন্তু সকল গুলিই সমান সন্তোষজনক নহে।

প্রধানতঃ আকৃতি ও আচার ব্যবহার এবং ভাষা অনুসারে মানবগণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত কবা যাইতে পাবে। কিন্তু আচার ব্যবহাব এবং ভাষা অবলম্বন করিয়া প্রকৃতপক্ষে উৎপত্তিগত একতা অথবা পার্থক্য নির্ণয় করা সঙ্গত নহে। একজাতির আচার ব্যবহার অপব জাতি অনুকরণ করিতে পারে। নানা কাবণে তাহা কবিযাও থাকে। ইহাতে ঐ জাতিদ্বয়েব সহিত মেলা মেশা ও সংশ্রব থাকা বিবেচনা কবা যায়। কিন্তু উভযজাতিব জন্মগত একতা অনুমান কবা সর্ব্বত্র সঙ্গত হয় না। আচাব ব্যবহাবেব কিযদংশ ধর্ম্মমূলক; তাহাও একজাতি অপর জাতি হইতে পাইতে পারে। এক্ষণে পৃথিবীব অনেক অসভ্য জাতি খ্রীষ্টান পাদরিগণেব চেষ্টায় খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে। তাহাতে উহাবা পাদবী সাহেবদিগেব সহিত একবংশীয হইয়া যায় না। পক্ষান্তরে, বংশগত একতা থাকিলেও আচারগত পার্থক্য থাকিতে পারে; ধর্ম্মও পৃথক হইতে পাবে। সুতবাং ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, আচার ব্যবহাব অবলম্বনে মানবের শ্রেণীবিভাগ কবিলে মূলতঃ ঐ সকল শ্রেণী একবংশীয় কি পৃথক, তাহা বলা যায় না।

সেইরূপ, ভাষার সাদৃশ্য অথবা বৈষম অবলম্বনেও সর্ব্বত্র জন্মগত ঐক্য অনৈক্য বুঝা যায় না। পৃথক বংশীয় মানবগণ এক ভাষা ব্যবহার করিতে এবং এক বংশীয় মানবগণ বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করিতে পারে। তুর্কীবংশীয় দিল্লীর বাদসা উর্দ্দু ব্যবহার কবিয়াছেন। তুর্কীর ভাষা [ অবশেষে ] ত্যাগ করিয়াছিলেন। অনেক কাফ্রী সম্প্রদায় ইংবাজি ভাষা অবলম্বন করিয়াছে। ভাষাব সাদৃশ্য ও বৈষম্য অনুসারে বর্ণ বিভাগ করাও সঙ্গত হয় না।

যদি আচার, ব্যবহার ও ভাষা অবলম্বনে মানবেব শ্রেণীবিভাগ করিলে জন্মগত ঐক্য অনৈক্য নির্ণয় করা সর্ব্বত্র সম্ভবপর না হয়, তবে আকৃতিগত সাদৃশ্য বৈষম্য অবলম্বন করতঃ শ্রেণী বিভাগ কবা ভিন্ন উপায়ান্তর দেখা যায় না। আকৃতিগত সাদৃশ্যে জন্মগত একতা অনুমান করা যায়। বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে পিতামাতাব এবং উভয় কুলের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় জাতকেব আকৃতি হইতে পারে। অন্ততঃ কতকাংশ সাদৃশ্য থাকিতে পারে; ইহা আমবা জানি। পক্ষান্তরে বিভিন্ন বংশীয়গণ বিভিন্ন আকৃতি লইয়া একদেশে বাস করিলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তুল্যাবয়ব হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদিগের আকৃতিব বৈষম্য তিবোহিত হইয়া ক্রমে সাদৃশ্য উৎপন্ন হইয়াছে—এরূপ কখনও জানা যায় নাই।

যদিও সম্প্রতি লোকতত্ত্ববিৎ ফ্রান্স্ বোয়াজ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, বিভিন্ন জাতীয় মানব আমেবিকা গেলে তাহাদের অপত্য আমেরিকার জলবায়ু প্রভাবে একটা নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে গড়িয়া উঠে, এবং ঐ অপত্যগণের মাথাব আকৃতি আমেরিকানগণের অনুরূপ হইয়া থাকে; তথাপি এই সিদ্ধান্ত অন্যান্য মানবতত্ত্ববিদ্গণ এখনও স্বীকার

করেন না; এবং ইহা এখনও বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং আকৃতির সমতা অনুসারে বংশের একতা অনুমান করা যাইতে পারে।

কিন্তু আকৃতির বৈষম্য অনুসারে বংশের পার্থক্য অনুমান করা যায় কি না? এক বংশীয়গণের কি আকৃতিগত পার্থক্য হইতে পারে না? এক পরিবারের মধ্যে ইহা অনেক সময়েই দৃষ্ট হয়। কিন্তু একটা জাতি বিবেচনা করিতে গেলে এখন আর ঐরূপ হয় বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। জীবের নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায়, এমন কি, মানুষেরও প্রথম অবস্থায়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে একবংশীয়গণ বিভিন্ন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে—এরূপ অনুমান করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। আধুনিক প্রধান প্রধান জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সকল মানুষই মূলে এক, এইরূপ বিবেচনা করেন; তৎপর কালক্রমে মানবের বংশবৃদ্ধি হওয়ায় এবং আহারের অসদ্ভাব হওয়ায়, এক বংশীয় ব্যক্তিগণই পৃথিবীর নানা প্রদেশে বিস্তৃত হইয়া বংশানুক্রমে বসবাস করিতেছে। ইহাতেই বিভিন্ন আকারের মানব উৎপন্ন হইতেছে। এই পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশে বসবাস করায় কেহ বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভাবে বিভিন্ন আকার উৎপন্ন হওয়া স্বীকার করেন, কেহ বা তাহা স্বীকার না করিয়া কেবল শুক্রশোণিতগত আভ্যন্তরীণ কারণ বশতঃ * ভিন্নাবয়ব গঠিত হয়, ইহা বলেন। কেহ বা উভয় কারণই ন্যূনাধিক অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা বশতঃ ব্যক্তির দেহে যে পরিবর্ত্তন হয়, তাহা স্বোপার্জ্জিত পরিবর্ত্তন অর্থাৎ নিজের জীবিত কালে বাহির হইতে সিদ্ধ হয়। ঐরূপ স্বোপার্জ্জিত পরিবর্ত্তন † বংশানুগত হয় না বলিয়া এক্ষণে প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন। যিনি অতি সাবধানে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পণ্ডিতপ্রবর মর্গান্‌ও বলিতেছেন, "ঐরূপ পরিবর্ত্তন বংশানুগত হইবার প্রমাণাভাব।" প্রথমে ওয়াইস্‌ম্যান এই সিদ্ধান্ত করেন, এক্ষণে প্রায় সকলেই ইহা স্বীকার করিতেছেন।

এই মত গ্রহণ করিলে পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভাবে বংশগত স্থায়ী পরিবর্ত্তন হওয়া স্বীকার করা যায় না। একারণ তদ্রূপ দৃষ্ট হইলে ঐ প্রভেদ স্থায়ী কি না, ইহাই অনুসন্ধান করিতে হয়। যদি স্থায়ী বলিয়া জানা যায়, তবে জন্মগত একতা বিবেচনা করা যায় না। আর, যদি উহা স্থায়ী না হয়, বরং মূলতঃ বিভিন্ন জীব একাকৃতি বলিয়াই জানা যায়; তবে উহাদিগের জন্মগত ঐক্য নির্ণয় হইতে পারে, দুইটী পার্ব্বত্য বৃক্ষ এক গণ ভুক্ত হইলে দেখিতে তুল্যাবয়ব হইবে। কিন্তু উহাদিগের মধ্য হইতে একটী সমতলে বপন করিলে পরপর বংশে প্রভেদ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। কিন্তু কতিপয় বংশ পরে যদি পুনরায় উহাকে পর্ব্বতের উপর বুনা যায়, তবে ক্রমে পূর্ব্বের পার্ব্বত্য অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝা গেল যে, সমতলে আসিয়া যে পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, তাহা স্থায়ী হইল না! এস্থলে উভয় বৃক্ষকে প্রকৃতপক্ষে একগণ-ভুক্ত জানি।

* Morgan's Evolution and Adaptation (1903) p, 460, Doncaster's Heredity (1911) p, 146, Thomson's Heredity (1908) p 507,

† Morgan's Evolution and Adaptation p 260,

সুতরাং যে স্থলে জানিনা, সে স্থলেও ঐ রূপ পরীক্ষা দ্বারা একবংশত্ব অর্থাৎ জন্মগত একতা অনুমান করা যায়।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, আকৃতিগত বৈষম্য দেখিলেই জন্মগত পার্থক্য বিবেচনা করা যায় না। ঐ পার্থক্য স্থায়ী জানা গেলে জন্মগত ভেদ স্বীকার করা যায়, নচেৎ যায় না। তবেই আকৃতিগত ক্ষমতা হইতে জন্মগত একতা বুঝা যায়; কিন্তু আকৃতির বৈষম্য হইতে বংশগত একতা অথবা বৈষম্য কিছুই নিশ্চয় করা যায় না।

সুতরাং মানবের শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উপায় আকৃতিগত সমতা অবলম্বন করা। কিন্তু আকৃতিগত বৈষম্য আচার ব্যবহারের ঐক্য অনৈক্য, ভাষার একতা অথবা প্রভেদ,—এ সকলকে যদিও শ্রেণী বিভাগের মূলভিত্তি করা যায় না, তথাপি আনুষঙ্গিক রূপে এ সকলও বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি এ সকল আলোচনার তথ্য নির্ণয়ের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ উপায়কে সমর্থন করে, ভালই; সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হইবে। নচেৎ কেবল ঐ সকলের উপর নির্ভর করিয়া মীমাংসা করা বৈজ্ঞানিক বিচার-সঙ্গত হইবে না।

কিন্তু এক্ষণে কথা উঠিতেছে এই যে, যদিও দেহগত সাদৃশ্য অবলম্বন করিয়া মানবের শ্রেণী বিভাগ করাই সঙ্গত হয়, তথাপিও দেহের কোন্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অথবা কোন্ অংশের সাদৃশ্য অবলম্বন করা উচিত? বর্ণতত্ত্ববিদ্‌গণ দেহের বর্ণ, কেশের গঠন ও বর্ণ, চক্ষুর বর্ণ ও অবস্থান; ব্যক্তির উচ্চতা করোটীর আকৃতি, মুখমণ্ডলের বিশেষতঃ হনুর অবয়ব, নাসিকার গঠন, এই কয়েকটী চিহ্ন অবলম্বন করতঃ শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন। কিম্বা এগুলির সকলের উপর সমান ভাবে নির্ভর করেন না। দেহের বর্ণ কিন্তু কয়েকটীর আকৃতি অপেক্ষা কেশের গঠন ও বর্ণ অধিকতর নির্ভর-যোগ্য। আবার নাসিকার গঠন অপেক্ষা হনুর আকৃতি অধিক বিশ্বাস-যোগ্য। বোধ হয়,কেশের গঠন,বর্ণ ও ভাব—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নির্ভরযোগ্য।+ বিখ্যাত পণ্ডিত কেশের ভাব ও গঠনের উপর নির্ভর করতঃ স্বীয় গ্রন্থে মানবের শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন। দেহের বর্ণ, করোটীর আকৃতি ইত্যাদিকেও উপেক্ষা করেন নাই, কিন্তু মূলে অবলম্বন করিয়াছেন, কেশের ভাব ও গঠন।

প্রমাণ বিষয়ে গুরুত্ব।

উপরে যে সকল লক্ষণের উল্লেখ করা হইল, তাহাদিগের গুরুত্ব, ক্রমে আলোচনা করা আবশ্যক। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এ কথা স্মরণ করা উচিত যে, ঐ সকল লক্ষণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে না, যাঁহারা পরিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব স্বীকার করেন, তাঁহারাও এ কথা বলিতে পারেন না যে,ঐ কারণে অল্প কালের মধ্যে ঐ সকল লক্ষণের গুরুতর [ব্যক্তিগত অথবা বংশানুক্রমিক] প্রভেদ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ সকল লক্ষণের দীর্ঘকাল-প্রচলিত একতা অথবা স্থায়ী বৈষম্য থাকিলে বংশগত ঐক্য অথবা অনৈক্য বিবেচনা করা যাইতে পারে।

দেহের বর্ণ।—এ বিষয় একটী মোটা কথা অনেকেই অনুধাবন করেন না। যাঁহারা এই বিষয়ে মত দিবার অধিকারী, তাঁহারা প্রায় সকলেই বিবেচনা করেন যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের জাতীয়-বর্ণ একবার নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেলে উহা আর পারিপার্শ্বিক কারণ

+ Hudson, The Races of Man, pp 7-19

বশতঃ বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তনের অধীন হয় না। * বর্ণ বিষয়ের প্রধান বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক পুণ্টন্‌ও এইরূপ বিবেচনা করেন বলিয়া বোধ হয়। সঙ্কর জাতীয়গণের বর্ণ সর্ব্বদাই বংশানুক্রমিক কারণে পরিবর্ত্তনের অধীন হইয়া থাকে, কিন্তু যে স্থলে জন্মগত সাংকর্য্য নাই,সে স্থলে শুধু পারিপার্শ্বিক কারণে দেহের বর্ণের বংশানুগত পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হওয়া স্বীকার করা যায় না। যদি এই কথাই সত্য হয়, তবে দেহের স্থায়ী বর্ণ অনুসারে *মানবগণের শ্রেণী বিভাগ* করা অসঙ্গত হয় না। বর্ণ বর্ণোপকরণের ( pigment ) উপর নির্ভর করে; শারীর ক্রিয়ার ফলে যেমন মল মূত্রাদি বর্জ্জনীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তেমনই বর্ণোপকরণও এক প্রকার বর্জ্জনীয় পদার্থ। কিন্তু উহার নির্গমনের দ্বার ত্বকের ছিদ্র। সুতরাং উহা ত্বকের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই বর্ণ নির্ণীত হইয়া থাকে। বর্ণ প্রথমাবস্থায় সম্ভবতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে পরিবর্ত্তিত হইত, কিন্তু উন্নত জীবে ( দীর্ঘকালে ) উহা যে স্থায়ীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আর বংশানুক্রমে ঐ কারণ বশতঃ পরিবর্ত্তিত হয় না, বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক, বর্ণানুসারে মানবজাতিকে † প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। (১) শ্বেত, (২) কৃষ্ণ ও (৩) পীত। এই বর্ণত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী বর্ণও অনেক দেখা যায়। শ্বেত, পীত ও কৃষ্ণ বর্ণের মধ্যবর্ত্তী কটা ও লোহিত বর্ণ এই দুই মধ্যবর্ত্তী বর্ণের সংযোগে প্রধান বর্ণত্রয় যেন ক্রমিক পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, ভূপৃষ্ঠের দক্ষিণাংশে কৃষ্ণ, উত্তরাংশে শ্বেত এবং মধ্য ভাগে পীতবর্ণ মানব বসবাস করে। এই উক্তি সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নহে, তথাপি স্থূলতঃ এইরূপ বলিলে বিশেষ দোষ হয় না।

কেশের গঠন ও বর্ণ।—কেশ ত্রিবিধ (১) লম্বা ও সরল, (২) ঢেউতোলা এবং চক্রাকার (৩) কোঁকড়া। ইহাদিগকে অন্য ভাষায় (১) সরল কেশ, (২) কুণ্ডল কেশ (৩) এবং কুঞ্চিত কেশ বলা যায়।* সরল কেশ সরু ও লম্বা, কুণ্ডল কেশ একটু মোটা ও তরঙ্গায়িত, কুঞ্চিত কেশ কোঁকড়া এবং স্থূল। কেশের বর্ণও পিঙ্গল, তাম্র এবং কৃষ্ণ ভেদে ত্রিবিধ। দেহের বর্ণের সহিত কেশের বর্ণের একতা প্রায় স্থলেই দেখা যায় না।

চক্ষুর বর্ণ ও অবস্থান।—চক্ষুর বর্ণও কাল, কটা ও পিঙ্গল হয়। ইহার সহিতও দেহের এবং কেশের বর্ণের একতা নাই।

পীতবর্ণ জাতির চক্ষু অক্ষি কোটরে বক্রভাবে অবস্থিত। উপরের পত্র পুরু এবং একটু নীচের দিকে ঝোলা। তাহাতেই এই সকল জাতির চক্ষু একটা অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

ব্যক্তির উচ্চতা।—মানবজাতির গড় উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। যাহারা ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, অথবা তদপেক্ষা উচ্চ, তাহাদিগকে লম্বা, এবং যাহারা ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি, তাহাদিগকে খর্ব্ব বলা যায়। ৪ ফুট ১১ ইঞ্চি মাত্র উচ্চ হইলে, সে জাতিকে বামন বলা যায়।

করোটীর আকৃতি।—ইহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত দ্বারা নির্ণীত হয়। মাথার পিছের দিকে যে একটু ঢিপি আছে, তাহা হইতে

* Perhaps when once fixed, pigmentation is a fairly constant character. ibid P. 2,

*এইরূপ কেশধারীদিগকে, (১) Leiotrichi (2) Cymotrichi এবং (3) Ulotrichi বলে।

ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর দিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্যের মাপ লইতে হয়; প্রস্থের এক কর্ণের উপর ভাগের সন্নিকটস্থ স্থান হইতে অপর কর্ণের ঐ স্থান পর্য্যন্ত। এ মাপ মাথার অগ্রভাগ ও পশ্চাদ্‌ভাগের মধ্যবর্ত্তী লাইনের উপর দিয়া লইতে হয়। এইরূপে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ অবধান করতঃ প্রস্থকে দৈর্ঘ্যদ্বারা ভাগ করিতে হয়, এবং ঐ ভাগফলকে ১০০ দ্বারা গুণ করিতে হয়। তাহা হইলে করোটীর প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যের অনুপাত জানা যায়। যথাঃ—

করোটীর অনুপাত $= \frac{\text{প্রস্থ} \times ১০০}{\text{দৈর্ঘ্য}}$—এই অনুপাত যদি ৭৫-এর কম হয়, তবে দীর্ঘ করোটী বলা যায়। আর যদি উহা ৭৫ হইতে ৮০ পর্য্যন্ত হয়, তবে উহা মধ্যম করোটী, এবং যদি উহা ৮০ সংখ্যার ঊর্দ্ধ হয়, তবে প্রশস্ত করোটী বলা যায়। কার্য্যতঃ অনেকে ৭৮ এর নীচে হইলে দীর্ঘ করোটী এবং উপরে হইলে প্রশস্ত করোটী বলিয়া থাকেন।

হনু অথবা চোয়ালী।—যাহাদিগের চোয়ালী সম্মুখের দিকে একটু অগ্রসর, তাহাদিগকে বর্দ্ধিত চোয়ালী * এবং যাহাদিগের চোয়ালী তদ্রূপ নহে, তাহাদিগকে সম-চোয়ালী বলা যায়। বর্দ্ধিত চোয়ালী অনুন্নত লক্ষণ; সমচোয়ালী† অপেক্ষাকৃত উন্নত লক্ষণ। এই প্রসঙ্গে মুখমণ্ডলের আকৃতির কথাও বলা উচিত। কাহারও কপাল গোল এবং টিপির ন্যায়; কাহারও চেপ্টা এবং উপরের দিকে ঢালু। কাহারও ওষ্ঠ মোটা, ‡ কাহারও পাত্‌লা। মুখের এবং নাসিকার গঠন অনুসারে মুখমণ্ডলের আকৃতি বিভিন্ন হইয়া যায়। ভ্রূর নীচের অস্থি কাহারও উচ্চ, কাহারও সমান। ইহা হইতেও মুখমণ্ডলের অবয়বের পরিবর্ত্তন হয়।

প্রায়শঃ দেখা যায় যে, ভ্রূর অস্থি উচ্চ হইলে চোয়ালীও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

নাসিকার গঠন।—কোন কোন জাতির নাসিকা উচ্চ, কাহারও নিম্ন; কাহারও নাসিকার পুটদ্বয় বিস্তৃত, কাহারও সঙ্কুচিত। নাসিকার মূল কোন জাতির কপালের সহিত প্রায় সমান উচ্চ; কাহারও তাহা হইতে অনেক নীচে। নাসিকার দৈর্ঘ্যও সকল জাতির সমান নহে। এই সকল লক্ষণের দ্বারা মানবজাতির শ্রেণী বিভাগ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহা বিশেষ নির্ভরযোগ্য হয় না।

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল, দেহের বর্ণ এবং প্রধানতঃ কেশের গঠন, ভাব ও বর্ণ অবলম্বন করিয়াই মানবের শ্রেণী বিভাগ করা সঙ্গত। মানবের প্রধান তিনটী শ্রেণীর নাম, ককেশীয়, মঙ্গোলিয়, এবং নিগ্রোয়েড্। ককেশীয়কে পূর্ব্বে আর্য্য বলা হইত, এক্ষণে ঐ শব্দ জাতিবাচক নহে, অর্থাৎ জন্মগত একতা ঐ শব্দের দ্বারা সূচিত হয় না বলিয়া উহা ঐ অর্থে আর ব্যবহৃত হয় না। ক্রমশঃ

শ্রীশশধর রায়।

* Prognathous

† Orthognathous.

‡ কাফ্‌রীদিগের অত্যন্ত মোটা।

# স্বর্গীয় কালীবর।

জন্ম—১২৪৯, মৃত্যু—১৩১৮, আশ্বিন।

গুণের আদর সর্ব্বত্র, যশঃ ও কীর্ত্তি চিরস্থায়ী, পরন্তু সকল সময় বা সর্ব্বাবস্থায় তাহাদের গুণরাশি সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ পায় না। অধুনা, যাঁহারা ধনী, অথবা যাঁহারা রাজসম্মানে বিভূষিত, তাঁহাদের জীবনী সংবাদ বা সাময়িক পত্রে নানা বর্ণে ঘোষিত হইতে থাকে, অথচ অর্থহীন ব্যক্তি পণ্ডিত বা বিদ্যালঙ্কারে ভূষিত হইলেও তাঁহাদের নাম বা গুণগ্রাম অনেকের নিকট অপ্রকাশ থাকে। অদ্য আমরা যে মহাত্মার জীবনী লিখিতে প্রয়াস পাইতেছি, তিনি অনেকের নিকট পরিচিত, সুতরাং আশা করি, তাঁহার এই জীবনী বুধমণ্ডলীর নিকট আদৃত হইবে।

পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ ছান্দড় নামা মহাপুরুষের অধস্তনে ষড়বিংশ সন্তান, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রায় সকলেই নৈয়ায়িক ছিলেন। এইরূপ কথিত আছে যে, ইঁহার এক জন পূর্ব্বপুরুষ প্রথমে ধুলিয়াপুর পরগণার দুলবালা গ্রামে বাস করেন, পরে জনৈক বিখ্যাত জমিদারের নিকট হইতে ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া তদীয় বাসস্থান, ২৪ পরগণার অন্তর্গত পুঁড়াগ্রামে আগমন করেন, তদবধি তাঁহার পরবর্ত্তী সন্তানগণ পুঁড়াগ্রামে বাস করিতেছেন।

পণ্ডিত কালীবর ১৭৬৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র; ইনি তাঁহার পিতার বার্দ্ধক্যের সন্তান। গোবিন্দচন্দ্রের উপযুক্ত সময়ে সন্তানাদি না হওয়ায় তাঁহার পিতা কালীর আরাধনা করিয়া প্রার্থনা করেন, যেন তাহার একটী যশস্বী, ধার্ম্মিক এবং গুণবান পৌত্র হয়। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার কামনানুরূপ, গোবিন্দচন্দ্রের একটী সন্তান হয়। কালীমাতার কৃপায় সন্তান হওয়ায় বালকের কালীবর নামকরণ হয়। কালীবরের পিতা গোবিন্দচন্দ্র উপযুক্ত পণ্ডিত হইলেও তাঁহার অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল ছিল না। অল্প মাত্র ব্রহ্মোত্তর ভূমি এবং কয়েক ঘর যজমান তাঁহার জীবনোপায় ছিল। তদ্দ্বারা কোন প্রকারে তাঁহার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কালীবর অতি বাল্যকাল হইতেই বিশেষ প্রতিভাশালী ছিলেন, সুতরাং পিতার হীনাবস্থা অনুভব করিয়া তিনি কখন উত্তম পান ভোজন বা পরিচ্ছাদির জন্য আব্দার করেন নাই। বরং যাহাতে নিজে সু-শিক্ষিত হইয়া পিতা মাতার সাংসারিক অভাব মোচন করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি পাঠশালে গুরুগৃহে অধ্যবসায়ের সহিত লেখা পড়া করিতে লাগিলেন। দশ বৎসর বয়ক্রমে ইনি পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ব্যাকরণ শিক্ষা আরম্ভ করেন। ইহার পর তাঁহার উপনয়নাদির ক্রিয়া সম্পাদন হয়। তৎপরে অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে পিতার নিকট হইতে যাজন ক্রিয়া শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালী বালক, প্রায় ষোড়শবর্ষ বয়ক্রম মধ্যে ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং কয়েক খানি স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার রচনা শক্তি ছিল,

মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা করিতেন। গ্রামে দুইটী কীর্ত্তনের দল ছিল, দলের অধিকারী তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও রচনা শক্তি দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের দলের গীতাদি রচনা করিতে বলিতেন। কালীবর নবীন বয়সে, নূতন আমোদ প্রমোদে মাতিয়া কীর্ত্তনের দলভুক্ত হওয়ায় লেখা পড়া সম্বন্ধে একটু উদাসীন হয়েন। এই অবস্থায় প্রায় ৪।৫ বৎসর কাল পর্য্যন্ত শিক্ষা-ত্যাগ-অবস্থায় ছিলেন। পরে কিছু দিন পরে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইলে তিনি বড়ই অনুতপ্ত হইলেন, এবং যাহাতে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন, তৎবিষয়ে গ্রামনিবাসী জগদীশ চন্দ্র বসু নামক একজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া অধ্যয়নার্থ ৺কাশীধামে গমন করেন এবং প্রবল আগ্রহসহকারে ছয় বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। বেদান্ত দর্শন শিক্ষা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, পরন্তু চতুষ্পাঠীতে যে কোন শাস্ত্র পঠিত হইত, তৎসমুদয়ও তিনি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন এবং স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল থাকায় উত্তর কালে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে নিপুণ হইয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীর শিক্ষা পরিসমাপ্তির পর তিনি তত্রত্য রাজকীয় পণ্ডিত-সভায় পরীক্ষা প্রদান করতঃ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বেদান্তবাগীশ উপাধি এবং পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ৺কাশীধাম বাস কালে তাঁহার যাবতীয় ব্যয়ভার বহরমপুর-নিবাসী মহাত্মা রামদাস সেন এবং পূঁড়ার উমানাথ রায় মহাশয় গ্রহণ করেন।

পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার রচনা-শক্তি ছিল, কালে শিক্ষার সহিত তাহা বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি একজন সুলেখক হইয়া উঠিলেন। এই সময় তিনি কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে ৺তারাচরণ তর্করত্ন বেদান্ত-দর্শন মতের অনুসরণ করিয়া পরমাণুবাদ খণ্ডন নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাহা নৈয়ায়িকগণের মনোমত না হওয়ায়, তাঁহারা "পরমাণুবাদ খণ্ডন খণ্ডন" নাম দিয়া যে প্রতিবাদ করেন, তাহা প্রকৃত ভাবে না হওয়ায়,কালীবর "পরমাণুবাদ খণ্ডন খণ্ডন খণ্ডনম্" নাম দিয়া প্রতিবাদের প্রতিবাদ করতঃ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া বিদ্বৎসমাজে বিতরণ করেন। তদ্দ্বারা তিনি বুধমণ্ডলীর নিকট বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময় নাটোরের মহারাজা চন্দ্রনাথ বাহাদুর কাশীতে ছিলেন, তিনি একজন গুণগ্রাহী এবং জ্ঞানপিপাসু, তিনি বেদান্তবাগীশের গুণগ্রাম এবং খ্যাতির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন এবং তাঁহার নিকট কাব্য ও শাস্ত্রাদি পাঠ করেন। অনন্তর সংসার এবং কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে কাশীধাম ত্যাগ করিতে হয়। সংসার-আশ্রমে থাকিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন, সুতরাং এক্ষণে তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য চেষ্টা করিতে হইল। এমন সময়ে শ্রীরামপুরের দে-বাবুদের সহিত আলাপ হয় এবং তাঁহার দ্বারা টীকা সহ মূল মহাভারতের নূতন সংস্করণ প্রচার করান। এতদ্ব্যতীত দে-বাবুদের ব্যয়ে তিনি "চন্দ্রকোষ" এবং "সর্ব্বার্থসংগ্রহ" নামক দুইখানি সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন, কিন্তু যথোচিত অর্থাভাবে তাহার প্রচার অসম্পূর্ণাবস্থায় বন্ধ হইয়া যায়।

এই স্থানে থাকিয়া তিনি নানাবিধ প্রবন্ধ রচনা করেন, "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় তাঁহার সাংখ্যদর্শন প্রকাশিত হয় এবং কালে তিনি তাহা সন্দর্ভিত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন। এইখানে তিনি কিছুকালের জন্য

গোস্বামী বাবুদের বাটীতে সভা-পণ্ডিতের পদে নিয়োজিত হন। এই সময় সংস্কৃত কালেজের প্রধান অধ্যক্ষ প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী সংস্কৃত মহাভারতের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেন, কিন্তু একাকী তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে না পারায় কার্য্য নির্ব্বাহের ভার কালীবর বেদান্তবাগীশের উপর অর্পণ করেন; এই উপলক্ষে তিনি শ্রীরামপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে আসিয়া তিনি নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছুকাল কলিকাতায় বাস করিতে হইয়াছিল। মধ্যে কেবল তিন বৎসর তাঁহাকে কলিকাতা ছাড়িয়া বহরমপুরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল, কাশীমবাজারের রাণী আর্ণাকালী দেবী তৎকালে বহরমপুরে জুবিলি-টোল নাম দিয়া একটী চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন এবং বেদান্তবাগীশের পাণ্ডিত্যাদি গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে উক্ত চতুষ্পাঠীতে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকতার কার্য্যে নিযোজিত করেন। কিন্তু তথায় তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিন বৎসর পরে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহার কার্য্য অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল, সভা সমিতিতে যোগদান, প্রবন্ধাদির লিখন পঠন, পুস্তক প্রণয়ন প্রভৃতি নানা কার্য্যে জড়িত হইয়া পড়িলেন। সেই সময় উপাধি পরীক্ষার সৃষ্টি হয়, তাহাতে তিনি প্রায় ৪ বৎসর বেদান্তের পরীক্ষক ছিলেন। তৎকালে তাঁহার সহিত অনেকের আলাপ পরিচয় হয়। তাঁহার সহিত যাহার একবার আলাপ হইয়াছিল, তিনি তাঁহার গুণরাশি এবং সৎ-ব্যবহার জন্য, তাঁহাকে ভুলিতে পারিতেন না। তাঁহার এক প্রধান গুণ ছিল যে, তিনি সকলের সহিত সমভাবে বাক্যালাপ করিতেন, কখনও তাঁহার পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না, সরলতা তাঁহার অন্যতম গুণ ছিল। সুতরাং এই সকল সদ্‌গুণে অনেকেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

ইংরাজী ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে (কলিকাতায়) হুগলী-নিবাসী বিখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্রজ্ঞ এবং নানা শিল্পজ্ঞ সারদা প্রসাদ ঘোষ (মদীয় পূজ্যপাদ পিতাঠাকুর) মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উক্ত ঘোষ মহাশয়ের সহিত কিছু কাল একত্র থাকিয়া সঙ্গীত চর্চ্চা এবং এক যোগে, হস্ত-লিখিত পুঁথি সংশোধন করিয়া, "সঙ্গীত-রত্নাকর" ও সঙ্গীত-পারিজাত" নামক দুইখানি সংস্কৃত সঙ্গীত সম্পাদন করেন।

পণ্ডিত কালীবর কখনও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার এমন অদ্ভুত স্মরণ শক্তি ছিল যে, তিনি যে কোন ইংরাজী শব্দ একবার শ্রবণ করিতেন, তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না। এইরূপে তিনি এতাধিক শব্দ আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ কখন কথা প্রসঙ্গে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিতেন, তিনি অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিতেন। আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি, কোন সংস্কৃত বা বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ কেহ বুঝিতে না পারিলে তিনি সে সকলের ইংরাজী প্রতিশব্দ দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া দিতেন, এমন কি, তিনি "পাতঞ্জল দর্শন" প্রভৃতির দুইখানি গ্রন্থের ভূমিকায় সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ মধ্যে মধ্যে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

পণ্ডিত কালীবর এইরূপ অনেক বিষয়ে সকলের নিকট স্মরণীয় হইয়াছেন। গুণের আদর সর্ব্বত্র,—বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে, তাই এক সময়ে, স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র, ভবানীপুরে তৎপ্রতিষ্ঠিত ভাগবত চতুষ্পাঠীতে, কালীবর

বেদান্তবাগীশকে সযত্নে আহ্বান করিয়া অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। তারপর সিভিলিয়ান আর, সি, দত্ত যখন হিন্দুশাস্ত্র প্রচার করেন, তখন তাহার ষড়দর্শনের অংশ বা খণ্ড তাঁহার দ্বারা সঙ্কলিত হয়। এইরূপে সংসার ক্ষেত্রে—কর্ম্ম ক্ষেত্রে পড়িয়া তিনি বহুল পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কলিকাতাস্থ পণ্ডিতগণ এক সময় সারস্বত সভা নামধেয় একসভা স্থাপন করেন, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। "এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষায় সর্ব্বদা অনুবাদিত হইয়া আসিতেছে, সে সকল ঠিক কিনা" তাহার বিচারই এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, বেদান্তবাগীশ সেই সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। কলিকাতার যোগ-সমিতি হইতে তিনি একটী মেডেল প্রাপ্ত হন, সভাপতি ছোটলাট বাহাদুর সর্ব্ব সমক্ষে স্বহস্তে তাঁহার গলদেশে এই পদক পরাইয়া দেন। এইরূপে তাঁহার নাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, নানা স্থান হইতে সময়ে সময়ে ক্রিয়া কর্ম্মে তাঁহার নামে নিমন্ত্রণ পত্র আসিত। এমন কি, অনেক গুণগ্রাহী ব্যক্তি তাঁহার গুণের জন্য বার্ষিক বৃত্তি পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চুঁচুড়ার ভূদেব মুখোপাধ্যায়, টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ইত্যাদি।

এইরূপে তিনি তাঁহার সমগ্র জীবন সাহিত্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। ক্রমে বার্দ্ধক্যের উপকণ্ঠে উপনীত হইলে যৌবনের উদ্যম শ্লথ হইয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে শরীরও নানাপ্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইল, সুতরাং আর তাদৃশ পরিশ্রমের সহিত সাহিত্যসেবা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, একেবারে নিশ্চিত হইয়া থাকিলে অর্থ সমাগম হয় না, সুতরাং ভগ্নদেহ লইয়াও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সাহিত্যসেবা করিতে হইত। তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থের মধ্যে "বেদান্তদর্শন" অতি উপাদেয় গ্রন্থ। বহুবাজার-নিবাসী মতিলাল ঘোষের প্রযত্নে ও ব্যয়ে, টীকা, ভাষ্য, ও বঙ্গানুবাদ সহ এই গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করেন। তৎপরে নন্দলাল পালের উদ্যোগে সটীক, সানুবাদ "বাশিষ্ঠ-মহারামায়ণ" তাঁহার দ্বারা প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে অনেকগুলি অসম্পূর্ণ এবং অপ্রকাশিতাবস্থায় লুপ্ত হয়। নিম্নলিখিত গ্রন্থনিচয় সম্পূর্ণ ও অদ্যাবধি প্রচারিত হইতেছে।

(১) বেদান্তদর্শন,(২) সাংখ্যদর্শন,(৩) পাতঞ্জলদর্শন, (৪) ন্যায়দর্শন, (৫) সটীক সাংখ্যসূত্রম্, (৬) সটীক পাতঞ্জল সূত্রম (৭) তত্ত্বসমাস সূত্র, (৮) সনৎসুজাতীয় ভাষ্য, (৯) পরমাণুবাদ খণ্ডন, (১০) অকাল কুসুম ( বাঙ্গালা উপন্যাস ) (১১) সংক্ষিপ্ত সানুবাদ গীতা। (১২) চরিত্রানুমান বিদ্যা, (১৩) গুরুশাস্ত্র, (১৪) সটীক বেদান্ত সংজ্ঞক, (১৫) আত্ম-রামায়ণ, (১৬) সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, (১৭) বেদান্তসার, (১৮) পরলোক-রহস্য, ইত্যাদি। 'পরলোক রহস্যই' তাঁহার শেষ গ্রন্থ, ইহা তাঁহার পরলোক গমনোন্মুখ অবস্থায় লিখিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। তদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত নিম্নলিখিত মাসিক পত্রাদির সহিত সংস্রব ছিল,—রহস্যসন্দর্ভ, আর্য্যদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, বামাবোধিনী, আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী, নব্যভারত, বঙ্গদর্শন, অনুসন্ধান, পুরোহিত, উপাসনা, সাহিত্যসংহিতা, ব্রাহ্মণ, প্রচার, প্রবাহ, (প্রথম সময়ের ) ভারতী, বান্ধব, অঙ্কুর ইত্যাদি। শেষোক্ত পত্রিকাখানি তাঁহার সহিত একযোগে মৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, নানাবিধ শিক্ষাসম্বন্ধে

তাঁহার দ্বারা আমার যথেষ্ট উপকার সাধন হয়, সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার তিনিই আমার প্রধান সহায় এবং পথপ্রদর্শক। সাহিত্য সেবায়ই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল, সাহিত্য সেবা করিতে করিতেই তাঁহার জীবনের অবসান হয়। ৬৯ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি স্ত্রী, কন্যা, ও হরিমাধব ও হরিপদ নামক পুত্রদ্বয়কে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সাহিত্যাকাশের একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া গেল। যদিও তিনি আজ পরলোকগত, তথাপি তিনি যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তদ্বারা তাঁহার নাম-জগতে চিরস্মরণীয় থাকিবে। জগতে কীর্ত্তিই চিরস্থায়ী,—

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

---

# আমুষ্মিক সখা।*

(১)

কোথা তুমি বান্ধব-প্রধান,
সহৃদয় সরল পরাণ,
তব শোকে প্রতি শিরা নীরব ক্রন্দনে
ব্যথার করুণ গীতি গাইছে সঘনে।

(২)

রবি হেথা দৃষ্টির ঈশ্বর
পূজা করে স্বার্থে নারী নর,
আপনি আপন নহে অন্যে ভাবে পর!
স্নেহ-রসে নাহি গলে কাহারো অন্তর!

(৩)

যার গলা ধরিবারে যাই,
বঁধু ব'লে হৃদয়ে বসাই,
সেই রক্ত পান করে দূরে চলে যায়,
এ দানবে ভালবাসা অমৃত না চায়।

(৪)

দয়াহীন, অকরুণ দেশে,
কেন আসিলাম আহা! ভেসে
বিশ্বাস প্রীতির রাজ্য কোথায়! কোথায়!
অর্দ্ধ অন্ধ ব'সে আছি জগৎ কারায়।

(৫)

বায়ু হেথা শব্দের জনক,
শোভা হেথা খনির কনক,
যোগীর হাসির মত সুখের আকার,
দুঃখের পরিখা দিয়া ঘেরা চারি ধার;

(৬)

কারা হ'তে কর মোরে বা'র!!
ভেঙ্গে ফেলে জীবনের দ্বার,
অসীম জগৎ হ'তে আকুল আহ্বান,
শুষ্ক আকাশের বুকে ত্যাগ করে প্রাণ।

(৭)

হৃদয়ের যাতনা ভীষণ,
স্পর্শ যদি করিত শ্রবণ,
ছুটে এসে কারা মুক্ত করিতে আমায়
ক্ষীণ প্রাণ দুঃখ ধ্বনি আকাশে মিলায়।

(৮)

ক্লান্ত হ'য়ে বিরহে আমার
গ্রহে গ্রহে কর হাহাকার!
মমতার শোকভরা আকুল রোদন
বিকল পরাণে, স্বপ্ন করায় শ্রবণ।

(৯)

চেয়ে চেয়ে আকাশের পানে
কেঁদে কেঁদে অবশ পরাণে,

---

*শব্দটী কিছু কর্কশ হইল। unborn friend এর প্রতিশব্দ পাইলাম না।

অগণ্য তারার মাঝে খুঁজি জন্মভূমি,
আর খুঁজি, কোথা সখা বসে আছ তুমি।

(১০)

চিরবিশ্ব কি? আঁখি দৃষ্টিহীন,
দরশনে গতি হয় লীন,
ভেদ করি গগনের শূন্য আবরণ,
দেখিবার সাধ্য নাই পূর্ব্ব নিকেতন।

(১১)

এসেছ এসেছ মনে করি,
খুঁজি তোমা জগৎ উপরি,—
তোমা ভেবে এই বিশ্বে যার কাছে ধাই,
জীবনের বিনিময়ে মৃত্যু সেথা পাই!

(১২)

এইভাবে কতদিন আর,
চিত্তহীন কারার মাঝার,
ভালবাসা হারা হ'য়ে করিব রোদন
কবে হবে এ বিয়োগে মধুর মিলন।

(১৩)

এ বিশ্বের কঠোর পরাণ
সতত সৌন্দর্য্য করে পান,
বালকের সরলতা হুরন্ত যৌবন
পান করি প্রমত্ততা করায় দর্শন;

(১৪)

শিশির মাখান ফুলদল,
জগতেরে করিতে উজ্জ্বল
না ছড়াতে মধুময় পরিমল ধারা
অমনি ধূলায় পড়ি কেঁদে হয় সারা।

(১৫)

স্নেহ ল'য়ে সরলা বালিকা,
যত্নে গাঁথি আশার মালিকা,
জগৎ করিতে চায় স্বর্গের মতন
তার স্বপ্নে জ্বালে অগ্নি হুরন্ত মদন।

(১৬)

কারা মাঝে দেহের শৃঙ্খলে
পুড়িতেছি—বাসনা-অনলে,
একটীও সাধ মোর হেথা মিটিল না,
এত ক'রে আপনার কেহ হইল না।

(১৭)

কপোলে কপোল মিশাইয়া
একবার সুধীরে চুমিয়া,—
বদনের আলো দিয়ে দেখিয়ে বদন,
ফিরে এসে সাধ হেথা করিতে রোদন।

(১৮)

হেথা সুখে নাহি পরশন
দুঃখে নাই ঘোর গরজন
অপূর্ণতা দিয়া গড়া নিখিল ভুবন,
সুখ দুঃখ সব জেন অপূর্ণ কেমন।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

# জাপান ও ভারতের সম্বন্ধ।

এসিয়ার মধ্যে বর্ত্তমানে জাপানই পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতার পূর্ণ আলোক নিজের ললাটে প্রতিফলিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জাপান তাঁহার এই নব উপার্জ্জনটাকে সমস্ত এসিয়াখণ্ডে বিলাইবার জন্য দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়াছেন, সমগ্র এসিয়াকে নব সভ্যতাপথে আবাহন করিতেছেন। জাপানের এই মহতী ইচ্ছা ও অপরিসীম এসিয়া-প্রীতি যদি কেহ উপলব্ধি করিতে না পারে, অধিকন্তু তাহার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণের সমক্ষে জাপানের অকীর্ত্তি রটনা করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে আমরা

তাহাকে কোন্ আখ্যায় অভিহিত করিব? জাপানের হৃদয়-নিহিত আদর্শ এবং মতি-গতির জ্ঞান বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতাই ইহার হেতু। কয়েক মাস ধরিয়া কোন বাঙ্গালী লেখক ভারতী পত্রিকায় জাপানের এইরূপ কুৎসা করিয়া আসিতেছেন। আমি নিজে পাঁচ বৎসর জাপানে ছিলাম এবং ইহার মধ্যে অন্ততঃ তিন বৎসরকাল নিখুঁত জাপানী ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়া আসিয়াছি। নিম্নতম শ্রেণীর জাপানী হইতে জাপানের মন্ত্রী-সম্প্রদায় পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। নিঃসঙ্কোচে বলিব, এই দীর্ঘ কাল মধ্যে কোন জাপানীর কথা, কার্য্য বা ব্যবহারে ভারতবাসীর প্রতি কোনরূপ অসদ্ভাব ইঙ্গিতে আলাপেও ব্যক্তিতে পারি নাই। ভারতী পত্রিকার লেখক বিশেষ কোর্স অধ্যয়নে ব্রতী হইয়া কিছুকাল জাপানে ছিলেন; জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকৃত ছাত্রের ন্যায় ( regular student ) অধ্যয়ন করেন নাই। কোন এক কৃষি-পত্রিকায় তিনি গম্ভীর ভাবে লিখিয়াছেন যে, জাপানী ভাষায় "ব্যাক্‌টিরিয়ার" প্রতিশব্দ নাই, ইহাতে তাঁহার জাপানী ভাষার জ্ঞান আছে বলিয়াও অনুমান করিতে পারি না। তবু, কোটি কোটি জাপানবাসীর মধ্যে কোন্ বিশেষ ব্যক্তির সংসর্গে আসিয়া তিনি জাপানের প্রতি বিরূপ হইবার কোন সুযুক্তিপূর্ণ কারণ লাভ করিয়াছেন কি না, তাহা তিনিই জানেন। ক্ষোভের সহিত জানাইতেছি যে, একাধিক ভারতবাসী ছাত্র জাপানে যাইয়া স্বদেশের মাহাত্ম্যোপযোগী ব্যবহার করিতে পারেন নাই। উহার দরুণ কেহ ব্যক্তিগত-ভাবে কোন বিশেষ দুর্ব্ব্যবহার লাভ করিলে তাহাতে সাধারণের ক্ষুণ্ণ হইবার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক, জাপানবাসীদের সঙ্গে যাঁহারা অন্তরঙ্গ ভাবে মিশিয়াছেন, যাঁহারা জাপানের স্নেহ-অঙ্কে থাকিয়া জাপানীদের সঙ্গে সহোদরের মত ভাবের আদান প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, জাপান ভারতের কেমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমার এই দীর্ঘকাল জাপান-প্রবাসের অভিজ্ঞতা দেশবাসীকে জানাইতে হইলে নিঃসঙ্কোচে বলিব, আমি জাপানীর সদ্ব্যবহার, অমায়িকতা এবং শিষ্টাচারে ঐ দেশের প্রতি চিরজীবন অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতে থাকিব।

ভারত জাপানবাসীদের গুরু, ভগবান বুদ্ধদেবের ( ওসাকাছামা ) জন্মস্থান, ভারতের সভ্যতার প্রভাবেই জাপানবাসী প্রথম জ্ঞানালোক পাইয়াছেন বলিয়া গৌরব করেন। ভারতবর্ষকে বহুকালাবধি জাপানের বৃদ্ধগণ স্বর্গ বলিয়া মনে করিতেন এবং আজও জাপানী ভাষার ভারতের অন্য নাম "তেন-জিকু", এই কথা আমাদের ভাবিতেও সুখ যে, আমাদের দেশকে অপর এক গণ্য জাতি স্বর্গ বলিয়া সম্মান করে।

বাস্তবিক, ভারতের পক্ষে বুদ্ধদেবের জন্ম কেমন গৌরবের বিষয়, তাহা সকলে অনুভব করিবেন। কবির ভাষায় বলিতে গেলে :—

"উদিল যেথানে বুদ্ধ আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষ দ্বার
এখনো জুড়িয়া অর্দ্ধ জগত
ভক্তিপ্রণত চরণে তাঁর।"

ভারতে বুদ্ধ-আত্মার উদয় কি গৌরবের বিষয়, যাঁহারা জাপান প্রভৃতি সুদূর সমুন্নত দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। বাস্তবিক, পল্লীতে পল্লীতে যখন আমাদের জন্মভূমি চট্টলার মত

পীত-কষায়-বসন-পরিহিত বাঙালী বা বৌদ্ধ-পুরোহিত নয়ন পথে পতিত হইত এবং তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ ও বুদ্ধমূর্ত্তি-সমন্বিত মঠ দেখিতাম, তখন সেই সুদূর প্রান্তে বসিয়া ভাবিতাম, কি মহতী শক্তিবলে বুদ্ধদেব জনহিত-কল্পে এই মহৎ ব্রত সাধন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মানবীয় সভ্যতা অসিম প্রভাবে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, কিন্তু ইহা সভ্যতা কি বর্ব্বরতা, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই নির্দ্ধারিত করিবেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁহার প্রশান্ত প্রেমের ধর্ম্ম দিয়া পৃথিবীর সুদূরতম প্রান্তেও কিরূপ প্রেম-মন্দাকিনী প্রবাহিত করাইয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে যুগপৎ পুলকিত ও বিস্মিত হইতে হয়। হায় বৌদ্ধধর্ম্ম! তুমি ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া চট্টলার শৈল-কন্দরে ও বারিধিবেষ্টিত লঙ্কাদ্বীপেই কেবল অবস্থান কর নাই, এখনও পৃথিবীর অর্দ্ধাধিক মনুষ্য তোমার আলোকে আলোকিত। এমন সাম্যের ধর্ম্ম, এমন সুনীতির ধর্ম্ম, এমন মানবের প্রীতির ধর্ম্ম যে জাতি পাইয়াছেন, সে জাতি উন্নত হইবেন, সন্দেহ কি? কবিবর রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই লিখিয়াছেন,—

"তোমারে আপন সাথে করিয়া সমান
যে ক্ষুদ্র মানবগণ করে অপমান
কে তাদেরে দিবে মান?
নিজ মন্ত্র স্বরে
তোমারে পরাণ দিতে যারা স্পর্দ্ধা করে
কে তাদেরে দিবে প্রাণ, তোমারেও যারা
ভাগ করে, কে তাদেরে দিবে একধারা।"

অর্থাৎ কবিবর দেখাইতে চাহিতেছেন, ভারতে "অহং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বৈদান্তিক মত এবং বিগ্রহাদির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার নিয়ম ও শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য প্রভৃতি ধর্ম্মের বিভাগ থাকাতে ভারতবর্ষ সমুন্নত হইতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে আমাদের নিজের বক্তব্য কিছুই নাই, বৌদ্ধদেশে সাম্য ও মৈত্রীভাবের যে বিশেষ বিকাশ ও স্বাধীনতাই তাহার ফল, ইহা যেন সহজেই অনুভূত হয়।

জাপানীরা আজকালও ভারতবাসীকে শ্রদ্ধার চক্ষেই দেখিয়া থাকে। বৌদ্ধমন্দিরে, এমন কি গির্জ্জায়ও ভারতবর্ষকে "তেন্‌জিকু" নামে এখনও বলা হয়। আধ্যাত্মিক ভাবে জাপানের আবালবৃদ্ধবনিতা আমাদিগকে স্বর্গবাসী হইতে হীন মনে করেন না। নিম্নোক্ত ঘটনাবলী হইতেই বুঝা যাইবে যে, জাপানীরা ভারতের শিষ্য বলিয়া অদ্যাপিও গৌরব অনুভব করেন। সাপ্পোরো নগরে অবস্থান কালে একদিন একজন বৌদ্ধপুরোহিত পর্ব্বোপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহ করিবার উদ্দেশে আমার বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন আমার সঙ্গী এক জাপানী ছাত্র "তেন্‌জিকুজিন" বলিয়া আমার পরিচয় প্রদান করেন। আমাকে বুদ্ধদেবের দেশের অধিবাসী জানিয়া বৌদ্ধপুরোহিত কয়েক মুহূর্ত্ত ভক্তিপূর্ণ-নয়নে একাগ্র-চিত্তে আমার দিকে তাকাইয়া রহিল, ও বারম্বার প্রণিপাত করতঃ আমার দান প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিল। সচরাচর দেখা যায়, ভারতবাসীরা বুদ্ধদেবের বংশধর, এই ভাবেই ধর্ম্মপ্রাণ গ্রাম্য লোকেরা আমাদের প্রতি সসম্মান দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। ধন্য অমিতাভ! তুমি সত্য সত্যই রাজা শুদ্ধোধনকে বলিয়াছিলে, "পিতঃ, তোমার স্বর্ণ-মণ্ডিত সিংহাসন চাহিনা; আমার সিংহাসন মানুষের হৃদয়-রাজ্যে সংস্থাপিত হইবে।" জাপানের শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও ভারতের প্রতি অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা বর্ত্তমান আছে। ছাপ্পোরো সদরকোর্টের জজ আমাদের আই-

নের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি একদিন আমাকে বলেন, "ছোটকালে পিতামাতার মুখে শুনিতাম যে, বুদ্ধদেব "তেনজিকু" হইতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাই খুব ভক্তি সহকারে ঔৎসুক্যের সহিত আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতাম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জানিতে পারিলাম যে, সেই স্বর্গ বর্ত্তমান ব্রিটীশ অধিকৃত ভারতবর্ষ (এইবিয়ো-ইন্দো)। তোমাদের দেশ হইতে আমাদের ধর্ম্মগুরু বুদ্ধদেব সাম্যের বার্ত্তা ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাই তোমাদের চরণে জাপানবাসী সকলেই তোমাদের মঙ্গল কামনা করিতেছেন। অতঃপর তিনি যে উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা পাছে রাজদ্রোহ আইনের আমলে আইসে, এই ভয়ে প্রকাশ করিলাম না। জাপানের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবেত্তাগণও প্রকাশ্য সভাসমিতিতে ভারতের নিকট প্রাচীন সভ্যতার জন্য ঋণী বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

আমাদের কৃষিকলেজের অধ্যাপক জাপানী ভাষার কয়েকটী বৈজ্ঞানিক শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে দেখাইতে গিয়া বলেন যে, "তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারতবর্ষ হইতে জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, ইহাই অনেক প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের মত।" ভারত অধঃপতিত হইলেও দৈনন্দিন ব্যবহারে জাপানীরা সর্ব্বদাই ভারতের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিই জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

ভারতীয় লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন যে, জাপানীরা স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে আমাদিগকে হীন-জীব বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছে; ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে সাধারণ জাপানীরা হয়তঃ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিত না; কিন্তু শিক্ষার সম্প্রসারণের সূচনা হইতেই সকলে জানিত যে, আমরা রাজনীতি-ক্ষেত্রে পৃথিবীর মধ্যে অতি দুর্ব্বল ও নিকৃষ্ট জাতি। যখন স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ-সংঘাতে সমস্ত ভারতবর্ষ তুমুলভাবে আন্দোলিত হইতেছিল, তখন ইহার একসংকীর্ণ আবর্ত্ত জাপানেও পৌঁছিয়াছিল। উহার প্রভাবে জাপানীদের অন্তরাকাশ হইতে ভ্রম-কুজ্ঝটিকা অপসারিত হইতেছে। যতই এদেশের স্বার্থত্যাগ ও বিসর্জ্জনের কথা সে দেশের সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশিত হইত, সামান্য মুটে মজুর ও বিস্বাওয়ালা পর্য্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করতঃ বলিত "তোমাদের দেশে স্বাধীনতার ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে, লোকে আত্মত্যাগী হইতে শিখিয়াছে, এই স্বার্থত্যাগের উপরই তোমাদের জাতীয় ভিত্তি সংস্থাপিত হইবে।"

ভারতের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গেই যে জাপানীরা এদেশকে স্বর্গের পরিবর্ত্তে ইন্দো বা ইণ্ডিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহা অমূলক। পুরাকাল হইতেই জাপানী ভূগোলে ভারতকে "ইগাসি ইন্দো" (পূর্ব্ব ভারত) বলিয়াই বর্ণিত আছে।

পথে ঘাটে অপরিচিত ভারতবাসীকে ডাকিতে হইলে কচিৎ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা "ইন্দোছান্" বলিয়া অভিবাদন করে বটে; "ইন্দোছান" শব্দের অর্থ ভারতীয় ভদ্রলোক-মহাশয়। এই ভাবে সম্বোধন অভিপ্রেত না হইলেও, তেমন তুচ্ছতাব্যঞ্জক নহে, ইহা বুঝিতে পারিতেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউনিফরম্ পরা থাকিলে কখনই তাহারা ওরূপ ভাবে সম্বোধন করে না। কোন ভারতবাসীকে শুধু ইন্দো বলিয়া অভিবাদন করিতে শুনি নাই; তবে ইয়ার্কি দিলে

কাহাকে কখনও ওভাবে সম্ভাষণ করে কি না, জানি না। অপর এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন, "গত তিন বৎসর যাবৎ আমরা জাপানের রাস্তাঘাটে নিগো নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছি। আজকাল আমরা জাপানীদের উপহাসের বস্তু হইয়া উঠিয়াছি। পাগলের পিছনে দলে দলে যেরূপ লোক ছুটে, ভারতবাসীর পিছনেও সেইরূপ দেখা যায়।" ভারতবাসীকে কখনও নিগ্রো বলিতে কোন জাপানীর মুখে শুনি নাই। তবে কালবংএর কাহাকেও দেখিলে ছোটছেলেরা কখনো কলম্বোর অধিবাসী মনে করিয়া "কবম্বোজিন" বা কলম্বোর লোক বলিয়া থাকে বটে। কিন্তু উপহাসের বস্তু বলিয়া মনে করে, কিম্বা পাগলের মতন পিছনে দলে দলে অনুসরণ করে, ইহা সত্যের অপলাপ বই নয়। বোম্বে প্রদেশের একজন যুবক পড়িবার ইচ্ছায় আমাদের ছাপ্পোরো সহরে তিনমাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন; আমার বন্ধু বেশ সুস্থকায় ও সুদীর্ঘ ছিলেন; কিন্তু শরীরের বংটী যথাসম্ভব কাল ছিল, তাঁহার প্রতিও কাহাকেও এমন ব্যবহার করিতে দেখি নাই। পাঁচটী বৎসর ছাপ্পোরো সহরে অবস্থান করিয়া আসিয়াছি, কেহত আমার প্রতি কখনও তুচ্ছতাব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ করে নাই। আমার প্রিয়বন্ধু আমার পূর্ব্বে এক বৎসর কাল ছাপ্পোরো সহরে কাটাইয়াছিলেন, তাঁহার উপরে কোন দুর্ব্বিপাক হইয়াছিল কি না, জানি না। এমন ভদ্র জাতির বিরুদ্ধে দেশে ফিরিয়া কুৎসা করা যথেষ্ট কৃতজ্ঞতার পরিচায়কই বটে।

কলেজ কিম্বা কারখানায় ঢুকিবার যথেষ্ট সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষের উপর কটাক্ষ করিতে লেখক মহাশয়ের অণুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। জাপান, কোরিয়া ও চীনের ছাত্রগণ কখনই প্রবেশিকা বিভাগের পাঠ্যশেষ না করিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইতে পারে না। কিন্তু ভারতীয় ছাত্রগণ উক্ত বিভাগে তিন বৎসর কাল না পড়িয়াও বিশেষ পরীক্ষায় প্রতিযোগীতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই কলেজ ঢুকিবার অনুমতি পান। কিওয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বি-এ, সাবন্ত এল, সি, ই, গোখলে, বি-ত্র ও বসু মহাশয় যে কীর্ত্তি রাখিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য উক্ত কলেজ উন্মুক্ত নহে কি? কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তোহোকু রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও খুব শ্রদ্ধার সহিত ভারতীয় ছাত্রদিগকে কলেজে ভর্ত্তি করিতেছেন। গত বৎসর আমাদের কনভোকেশন্ সভার পরে আমার বিদায় উপলক্ষে এক সভা হয়; সেখানে আমাদের ডাইরেক্টর মহোদয় বলিয়াছিলেন, "ভারতীয় ছাত্রগণ স্বভাবতঃই চরিত্রবান; এবং এদেশ একটা নৈতিক আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারে। দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ও সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট আমার বাসায় আসিয়া আমার নিকট প্রীতি জ্ঞাপন করেন। সবই কি বাহ্যিক? এক বৎসর কাল জাপানী অধ্যাপকগণ বিশেষ ক্লাস করিয়া দুইজন ভারতীয় ছাত্রকে ইংরাজী ভাষায় কৃষি কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বৎসরান্তে পরীক্ষার দিন তাঁহারা শনৈঃ শনৈঃ ক্লাস হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্ত অত্যধিক হইলে ভারতীয় ছাত্রের পথ রুদ্ধ হইবারই কথা, কারখানাও তদ্রূপ ব্যাপার। ভারতীয় ছাত্রেরা নিজেরাই পরস্পরের নামে স্বত্বাধিকারীর নিকট নানা প্রকার কুৎসা ও দুর্নাম রটনা করিয়া থাকে, আর অনেকেরই

শিখিবার কোন উদ্দেশ্যই থাকে না। হয়তঃ ছয় মাসের মধ্যেই দেয়াশালাই, পেন্সিল ও সাবান, তিন বিষয়েই "এক্সপার্ট" হইতে চাহে। কিন্তু, সব দোষ নন্দঘোষ।

কাউণ্ট ওকুমাকে সর্প বলা হইয়াছে। নিজের ঘর শুদ্ধ নাই, দোষ হইল পরের। ইন্দো-জাপানী এসোসিয়েসন্ অনেক ভারতীয় ছাত্রকে পাথেয় দিয়া দেশে পাঠাইয়াছেন। অনেকে সেই টাকা শোধ করা উপযুক্ত মনে করেন নাই। তোকিওতে ইণ্ডিয়া-হাউস ও সময়ে সময়ে ওখান হইতে টাকা হাওলাত করিত, এমন কি, ইন্দো-জাপানী এসোসিয়েসনের টাকা জমা দিয়াই এসোসিয়েসনের ঘর ভাড়া করা হয়। কাউণ্ট ওকুমার একমাত্র দোষ এই যে, তিনি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তোকিও নগরীতে শিবাজী উৎসব উপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

"ইংরেজকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইয়া স্বয়ং ভারতের কার্য্য প্রণালী চালাইবার সুখ-স্বপ্ন অল্প সংখ্যক উর্ব্বর-মস্তিষ্ক ভারতবাসী পোষণ করে বটে, সমস্ত পৃথিবীর জনসাধারণের এক মাত্র মত এই যে, ভারতবর্ষ এখনও স্বায়ত্ব-শাসনের উপযুক্ত হয় নাই। কেবল মাত্র ইংলণ্ডের সহায়তায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার ধীরে ধীরে পৃথিবীর মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার আশা করিতে পারে। জাপানের পক্ষ হইতে এই বলিতে পারি যে, ভারতের প্রতি আমরা সর্ব্বদাই আন্তরিক সহানুভূতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতেছি, ভারত যেন সভ্য ও উন্নত জাতি সমূহের মধ্যে উন্নীত হইয়া স্বাধীন ভাবে মিশিতে পারে।" এখানে কাউণ্ট ওকুমার সর্পোচিত কোন্ লক্ষণ প্রকাশ পাইল, বর্ত্তমান ভারতবাসী তাহা চিন্তা করিতে পারেন। ইন্দো-জাপানী-সমিতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, কার্য্যকরী সভায় জাপানী মেম্বরের সংখ্যাই অধিক, সাধারণ মেম্বরের সংখ্যার অনুপাতেই ত কার্য্যকরী সভার মেম্বর নির্ব্বাচিত হইবে; ইহাতে আপত্তি কি? কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব জাপানী বাণিজ্য-দূত মিষ্টার হিরাতার নিকট ইন্দো-জাপানী-সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করিলে পর তিনিত কই উক্ত নগরীতে জাপানী সভ্যসংখ্যা কমাইবার আশঙ্কায় কোন আপত্তি করেন নাই। ইন্দো-জাপানী এসোসিয়েসন পর্য্যটক ভারতীয় ভদ্রলোকদের নিকট হইতে টাকা উশুল করেন, ইহা অন্য এক আপত্তি। দুই বৎসর পূর্ব্বে বরোদার মহারাজা যখন তোকিও নগরীতে যান, ভারতীয় ছাত্রেরা এক বড় "ইণ্ডিয়া হাউস' করিবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট চাঁদা চাহিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। এ বিষয়েও তাঁহারা একমত হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কি? সিঙ্গাপুর ষ্টেসনে এক অর্দ্ধশিক্ষিত যুবক অগ্রণী সাজিয়া ফুলের তোড়াটী পর্য্যন্ত ইংরেজ দূতের সেক্রেটারী বামবোল্ডের হাতে দিয়াছিলেন। যাঁহারা নিজেদের শাসনে রাখিতে পারেন না, তাঁহারা ইন্দো-জাপানী-সমিতির মত সভাকেও অনুশাসন করিতে চাহেন।

শেষকালে, জাপানী ছাত্রের দুই একটী ব্যবহার-প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করিতে পারি; তাহা প্রকৃত ব্যবহার কিনা এবং উহা কোন্ উদ্দেশ্যে কৃত হইতে পারে, তাহা সকলেই চিন্তা করিবেন। তোহোকু রাজকীয় কলেজে অধ্যয়ন কালে অধ্যাপকের অনুপস্থিত সময়ে একদিন সঙ্গীয় ছাত্রেরা পরস্পর রহস্য-কৌতুকে মত্ত হইয়াছিল। বোর্ডের উপর সহপাঠী ছাত্রগণের দেশ উল্লেখ করিয়া লেখা

হইতেছিল, অমুক দেশে ঘোড়া নাই; অমুক দেশে ট্রাম নাই ইত্যাদি। আমার পালা আসিলে কোন ছাত্র অপরূপ কৌতুক-কটাক্ষ পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে লিখিয়া গেল যে, আমার "দেশ" নাই। বলা বাহুল্য, আমি বন্ধুর এই রসিকতাকে দুর্ব্বহ মনে করিয়াছিলেন। এই জাতীয় আরও কতিপয় দুর্ব্ব্যবহারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতে পারে, তবে তাহা তুচ্ছভাব-প্রণোদিত কিনা, ঠিক বলিতে পারি না। জাপানী ছাত্রের আদর্শ বিষয়ে একটী কথা এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। দীর্ঘকাল এত ছাত্রের সঙ্গে মিশিয়াছি; কিন্তু কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে শুনি নাই, তুমি দেশে ফিরিয়া কোন্ চাকুরী গ্রহণ করিবে বা কত মাহিনা পাইবে? অবিচ্ছিন্ন ভাবে যেন একবাক্যে সকলেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তুমি ভারতে ফিরিয়া দেশের কি কাজ করিবে? তোমার দুঃস্থ দেশের জন্য কোন্ প্রণালীতে কার্য্য করিবে? এই ঘটনার মধ্যে কি সমস্ত জাতিটার আন্তরিক মহত্ত্বটুকু প্রকাশ পাইতেছে না? ভারতবর্ষের বিষয়ে এবং ভারতীয় যুবক সম্বন্ধে ঐ জাতি কোন্ ধারণা পোষণ করিতেছে ও তাহাদের নিকট কি আশা করিতেছে? মোটকথা, জাপানে ভারতীয় ছাত্রের পসার বাড়াইতে হইলে শিক্ষিত যুবকদের দলে দলে প্রেরিত হওয়া উচিত। শিক্ষামন্ত্রী, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর প্রভৃতিও এ বিষয়ে আমাকে দেশে ফিরিবার সময় বিশেষ ভাবে বলিয়াছেন। চরিত্রবান, শিক্ষিত ও অধ্যবসায়ী ভারতীয় যুবকের জন্য স্কুল কলেজ ও কারখানার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। শিক্ষামন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট টেলিফোন দ্বারা অনুরোধ করিলেই স্কুল কলেজ ঢুকিবার সুবিধা করিয়া দিবেন বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিয়াছেন। ভারতীয় যুবকগণ দলে দলে শিল্প কৃষির আলো আহরণ করিয়া জননী জন্মভূমির মুখচন্দ্রমার কলঙ্ক-কালিমা অপনোদন করিতে অগ্রসর হউন। কোনরূপ গুরুর গল্পে অথবা অকৃতকার্য্যতার গল্পে ঈর্ষার কোলাহলে ভুলিবেন না।

শ্রীপ্রমোদাকুমার বিশ্বাস।

# দুর্গাপূজা।

শিশির-মাখা শেফালিকার মৃদু মধুর সৌরভে; ফুটন্ত কমলের মনোহর সুষমায়, এবং নির্ম্মল আকাশের উদার নীলিমায়, কি যেন একটা অনির্ব্বচনীয় ভাবময়ী, মাদকতা-বিহীন মাধুরীর উন্মেষ করিয়া, প্রকৃতির কেলিনিকুঞ্জের বার্ষিক অতিথি শরৎসুন্দরী নীরব ভাষায় যে দুর্গারূপিণী মহাশক্তির আগমনী সঙ্গীত, প্রতিবর্ষে, গাহিয়া থাকে, সেই সনাতনী জগজ্জননীর শরৎকালীন মহাপূজার সহিত, হিন্দুগণ কত কালাবধি পরিচিত, তাহা সম্যক প্রকারে নির্ণয় করা যায় না। দশভুজা বৈদিক দেবতা নহেন, বৈদিক দেবতার সংখ্যা তেত্রিশটী, যাঁহারা বর্ত্তমান সময়ে কোটী গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের বেদোক্ত সংখ্যা যে এত অল্প, তাহা হয় তো অনেকের বিস্ময়াবহ হইতে পারে।* বৈদিক যুগে, তেত্রিশ সংখ্যক দেবতারাই যজ্ঞ ও মন্ত্রাদির দ্বারা উপাসিত হইতেন, উহারাই মর্ত্ত্যগণের

* বৈদিক দেবতা ১২ আদিত্য, ১১ রুদ্র, ৮ বসু, ২ অশ্বিনীকুমার, (৩৩)

নিগ্রহ ও অনুগ্রহের বিধাতা ছিলেন। সেই জন্য উহাদের নিকট বাঞ্ছিত ফল যাচিত হইত। কাহারও মতে উহারা মন্ত্রের অধীন ছিলেন।

"দেবাধীনং জগৎসর্ব্বং মন্ত্রাধীনাশ্চ দেবতাঃ"

"মন্ত্রাত্মকো হি দেবঃ"

দেবগণ বৈদিকযুগে, ঘটে, পটে বা প্রতিমায় আবির্ভূত হইতেন না, মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিয়া উহাদের উদ্দেশে, সংস্কৃত বহ্নিতে আহুতি প্রদান করা হইত। উপনিষদেও কোন দেবতা পূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, উপনিষদের প্রতিপাদ্য, নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনি জ্ঞানগম্য, নিষ্কল ও নিরঞ্জন, ধ্যান ধারণা ও সমাধি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার তত্ত্বের উপলব্ধি হয় মাত্র, তাঁহার প্রত্যক্ষতা নাই। একমাত্র কোনোপনিষদে ব্রহ্মশক্তির নারীরূপে, বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়,—এবং তিনি উমা হৈমবতী নামে বর্ণিত।

"স এতস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয় মাজগাম
বহু শোভমানা মুমাংহৈমবতীঃ,"

(কেনোপনিষদ্)

সর্ব্বত্র এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত যে, ত্রেতা যুগে, রামচন্দ্র, রাবণ বধার্থ, শরৎকালে নানা তীর্থাহৃত বারিপূর্ণ ঘটে, অষ্টাধিক শত নীল-পদ্মে, দুর্গারূপিণী মহাশক্তির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে বা অধ্যাত্ম রামায়ণে, ইহার কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না; শুনা যায়, অদ্ভুত রামায়ণে নাকি এই আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। কৃত্তিবাস কবিও, বোধ হয়, স্বরচিত বাঙ্গালা রামায়ণে উদ্ভূত রামায়ণের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে বর্ণিত আছে যে, সুরত নামক রাজা ও সমাধি নামক বৈশ্য, দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা তাহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।

"তৌ তস্মিন্ পুলিনে দেব্যাঃ কৃত্বামূর্ত্তিং মহীময়ীং
অর্হণাং চক্রাতুস্তস্যাঃ পুষ্প ধূপাদি তর্পনৈঃ"॥

এই শ্লোকই, বোধ হয়, বর্ত্তমান প্রতিমা পূজার সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ। যে সময়ে, যে ভাবে দুর্গারূপিণী সনাতনী শক্তির অর্চ্চনার আরম্ভ হউক না কেন, উহার ভিত্তি যে বিশ্বাস ও ভক্তির উপরে সংস্থাপিত, তাহার কোন সন্দেহ নাই। বিশ্বাস ও ভক্তির প্রবলবেগে আকুল হইয়াই হিন্দুগণ একসময়ে প্রেমাশ্রু পূর্ণ নয়নে, ও কৃতাঞ্জলি পুটে বাষ্প-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—

—"আগচ্ছাগচ্ছ দুর্গেত্বং দুঃখ দারিদ্র্য-হারিণি"
"গৃহীত্বা শারদীং পূজাং কল্যাণং কুরু মে সদা'
"অর্ঘ্যমন্নং ফলং পুষ্পং মাল্যং মলয়বাসিনি।
মযাদত্তানি সর্ব্বাণি গৃহাণ পরমেশ্বরি!"

যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়ী পরম শরণ্যা, সর্ব্বহৃদয়ে যিনি বুদ্ধিরূপে অবস্থিত, এবং যিনি স্বর্গ ও অপবর্গের প্রদানকর্ত্রী, সেই দশভুজা-রূপিণী সনাতনী শক্তির অর্চ্চনা যে অজ্ঞানান্ধতা হইতে প্রসূত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহার মূলে দিব্যজ্ঞানের পরম জ্যোতিঃ সমুদ্ভাসিত। যে মহাশক্তি জগৎরূপে প্রকাশিত, তাহার কোন রূপই অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না, যে ভক্তের হৃদয়ে তিনি যেরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই ভক্তগণ তাঁহাকে সেই রূপে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

সনাতনী শক্তির উপাসনা যদি কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে অধিকারী ভেদে উপাসনার বিবিধ পন্থা নিন্দনীয় নহে। যিনি অনন্ত, তাঁহার উপাসনার নির্দ্দিষ্ট একটী সীমা থাকিতে পারে না, তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ করা যেমন অন্যায়, উপাসনায়ও নির্দ্দিষ্ট সীমা অবলম্বন

করা ততোধিক অন্যায, কারণ, নির্দ্দিষ্টতার মধ্যে একটা আপেক্ষিক ক্ষুদ্রতা আছে। বিভিন্ন প্রকার উপাসনার মূলে যদি একটা ধ্রুব সত্য না থাকিত, তাহা হইলে জগতে উহার অস্তিত্ব আদ্যমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিত না। উপাসনার বৈলক্ষণ্য থাকিলেও প্রতিপাদ্য বস্তু লইয়া মতদ্বৈধ নাই।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথ জুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব"॥

(মহিম্নস্তব)

ভগবান্ অনির্দ্দেশ্য, তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, ভক্তগণ আপন আপন রুচি অনুসারে, তাঁহার কল্পনা করে। যাহারা নিরাকারবাদী, তাহারাও জ্যোতির্ম্ময় হউক বা আকাশময় হউক বা অন্য কোনও প্রকার হউক, কোন না কোন একটা আকৃতি তাহাদের মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে, কারণ, চিন্তা নিরাবলম্ব নহে। শক্তিমান ও শক্তির পৃথক উপলব্ধি হয় না, উভয়ের পার্থক্য বা ভিন্ন সামযিক জ্ঞান বা অনুভূতি, যুক্তি ও স্বভাব-বিরুদ্ধ, বহ্নি ও তাপ কোন বিজ্ঞানবিৎ বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, এই হেতু, প্রাচীন পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভিন্নতার অঙ্গীকার করিয়াছেন। যেমন জ্ঞান বলিলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়েরও যুগপৎ অনুমান হয়, তেমন, শক্তি বলিলেও, শক্তিমানের অনুমান হইয়া থাকে। শক্তি বলিলেই শক্যেরও অনুমান স্বভাবসিদ্ধ। কার্য্য বলিলে, তাহার নির্ব্বাহক কর্ত্তার সাহায্যের আবশ্যকতা, কর্ত্তৃত্ব ক্রিয়া ব্যতীত থাকিতে পারে না, ক্রিয়া বলিলেই সাবয়ব কর্ত্তার অনুমান অবশ্যম্ভাবী। বায়ুর কর্ত্তৃত্ব আছে কিন্তু অবয়ব নাই কেন? এরূপ প্রশ্ন সকলের মনেই জাগরূপ হইতে পারে। প্রত্যুত্তরে বলা যাইতে পারে "বায়ুরও অবয়ব আছে" কিন্তু উহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষতা নাই, ইহা এক মাত্র ত্বগিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য।

তিনি বিশ্বকর্ম্মা মহাশক্তি, সাবয়ব কর্ত্তৃত্বের অনুমানে উপাসকগণকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না।

সাধনা, জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, এই ত্রিপথগামিনী। এই ত্রিবেণীর স্রোত অবলম্বন করিয়া সাধকগণ অনন্ত ভূমায় উপনীত হইয়া থাকেন। জ্ঞানের চক্ষে যাহা নিষ্কল, নির্গুণ, নিরঞ্জন ও নিরবয়ব, কর্ম্মীর নিকট তিনি সর্ব্বক্রিয়াত্মিকা, সর্ব্বশক্তিময়ী, সাকারা সনাতনী শক্তি। সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিই, সৃষ্টিতে ব্রহ্মাণী, পালনে বৈষ্ণবী ও ভঙ্গে মাহেশ্বরী শক্তি অভিহিত হইয়া থাকেন। ভক্তগণের চক্ষুতে কখন তিনি মাতা পিতা, কখনও সখা, কখনও বা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রাজরাজেশ্বরী, কখন বা মহাপ্রভু রূপে প্রকাশিত হয়েন।

দুর্গাপূজায়, ভক্তির প্রাবল্য সত্ত্বেও উহা জ্ঞান ও কর্ম্মের সংশ্রব-শূন্য নহে। দুর্গা পূজার কামনা গৌরীলোক প্রাপ্তি, গৌরীলোক বলিলে, বিল্ব-বৃক্ষ-সমাচ্ছন্ন, অপ্সরোগণ নিষেবিত ও নানা পক্ষিরব-মুখরিত, কৈলাস পর্ব্বতের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান বুঝায় না। কিম্বা যে স্থান বিদ্যাধরবালাগণের মঞ্জীর শিঞ্জন-সম্বলিত সুললিত নৃত্যে, প্রফুল্ল মন্দার পুষ্প বৃন্দের সৌরভে, এবং মন্দাকিনী তরঙ্গসঙ্গত সুশীতল সমীরে, সর্ব্বদা সুখাবহ এবং যে স্থানে দিব্য স্ত্রীগণের করকঙ্কণ ঝঙ্কারে অমৃতায়মান চামর ব্যজনে, আগন্তুকগণ আপ্যায়িত হইয়া থাকেন, সে স্থান ও গৌরীলোকের মুখ্যার্থপ্রতিপাদক নহে, ইহা ব্রহ্মলোক বা গোলোকের নামান্তর মাত্র। গৌরীলোকের স্বরূপ কঠোপনিষদে ও গীতায়

কথঞ্চিৎ অবগত হওয়া যায়। ইহা অন্য লোক নহে, ইহা "তদ্বিষেতাঃ পরমং পদং"

ন তত্র সবিতা ভাতি ন চন্দ্র তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্ত মনু ভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

(কঠোপনিষদ)

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ
যদ্ গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

(গীতা)

এই গৌরীলোক প্রাপ্তিই, দুর্গা পূজার উদ্দেশ্য, উপাসকগণ, ভক্ত্যাত্মক দাস্য ভাবেই জগজ্জননী মহাশক্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। উপাসকগণের হিতের নিমিত্ত, মহাশক্তির কল্পিত মূর্ত্তি প্রতিমা, বা ঘটে পটে আহ্বান করিয়া তাহার পূজা করা হইয়া থাকে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধও নাই। ভক্তগণ ঘটে পটে বা প্রতিমায় সর্ব্বস্বরূপা, সর্ব্বেশ্বরী, সনাতনী শক্তির আবির্ভাব হইয়াছে, মনে করিয়া, নিতান্ত ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত বলিয়া থাকেন :—

"অদ্য মে সফলং জন্ম, অদ্য মে সফলা ক্রিয়া।"

দুর্গার প্রতিমূর্ত্তির বিষয় চিন্তা করিলে, উহাতে সুন্দর অন্তর্ভাবের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। দশভুজা মহাশক্তি, দশ হস্তে দশ অস্ত্র ধারণ করিয়া দুর্দ্দান্ত মহিষাসুরকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার পরিবার কার্ত্তিকেয়, গণপতি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয় পার্শ্বে অবস্থিত, ঊর্দ্ধে শিব। এই প্রকার মূর্ত্তি নির্ম্মাণের তাৎপর্য্য এই প্রকার অনুমিত হয় যে, জীবাত্মা যুগপৎ দশ লক্ষণযুক্ত ধর্ম্মরূপ অস্ত্র দ্বারা পাপরূপ মহাসুরকে নাশ করিতেছেন, অর্থাৎ পাপ নাশ করিতে হইলে দশবিধ ধর্ম্মাবলম্বন করার আবশ্যক। ধর্ম্মই পাপ নাশের অমোঘ মহাস্ত্র।

"ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ,
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং।"

(মনু)

কেবল মনু নহে, মহাত্মা যীশু মহাম্মদেরও দশটী আদেশ আছে, সেই আদেশ শুনিয়া অনুষ্ঠানে পাপ সয়তানের দর্প খর্ব্ব করিয়া নিষ্পাপ হইতে হয়। পাপ বিনষ্ট হইলে, বিঘ্ন নাশ ও সিদ্ধি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী, এই অর্থ বুঝাইবার জন্য বোধ হয় সিদ্ধিদাতা, বিঘ্ননাশন গণেশের আগমন, প্রভূত শক্তি প্রদান করিবার জন্য শক্তিধর কার্ত্তিকেয়ের আবির্ভাব এবং জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য দান করিবার জন্য জ্ঞানময়ী সরস্বতী ও ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর উপস্থিতি। অর্থাৎ যে সিংহবৎ প্রবল বীরত্ব অবলম্বন করিয়া ধৃতি, ক্ষমা, দম প্রভৃতি দ্বারা পাপের বিনাশ করিয়া পরম পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সিদ্ধি, শক্তি, জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকে। যে নিষ্পাপ ভক্তগণ, সিদ্ধি প্রভৃতি আপাত-মধুর ঐহিক সুখের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ হইতে বাসনা করে না; কেবল শিবময় ভূমায় মিলিত হইতে চাহেন, তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্যই, বৈরাগ্যময় মহাযোগী শিবের প্রকাশ, অর্থাৎ যে নিষ্পাপ বিশুদ্ধ আত্মা প্রেয়ের আপাত মধুরিমাকে নগণ্য মনে করিয়া শ্রেয় লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত, সে শিবময় তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে পারে। "শান্তং শিবমদ্বৈতং তত্তুরীয়ং।"

ভক্ত, যত দিন বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত না হয়, তত কাল, তাহাকে সাধনা করিতে হয়, সিদ্ধির পর আর সাধনা কি? তখন সাধক পূর্ণ-মনোরথ হইয়াছে, এই দুঃখ-বহুল অভাব-

পূর্ণ সংসারে তখন তাহারই বিজয়, সে পাপকে পরাভূত করিয়া বিজয়ী হইয়াছে, এখন আর ক্রিয়ার আবশ্যক কি? এই বিজয়ার দিনেই বিসর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ। অর্চ্চনা বল, আর ধ্যান ধারণা যাহা কিছু বল, সকলেরই বিসর্জ্জন সেই বিজয়ার দিনে, কারণ সাধক তখন ক্রিয়ার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই ত্যাগের পর শান্তি, "ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং" তখন "সর্ব্বাপচ্ছান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ" শান্তির পর আলিঙ্গন বা "কোলাকোলি," ইহাই সাধনার শেষ ফল। বিশ্বজনীন প্রেম, মধু হইতেও মধুর, হৃদয়স্থিত প্রেমই আলিঙ্গন-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে, ইহার সহিত পার্থিব সংশ্রব নাই, ইহা দেব-বাঞ্ছিত অমৃত এবং সর্ব্বাপেক্ষা পরপারে অবস্থিত। কি উদার ও মধুর ভাব! সুকোমল বাহু বেষ্টনে অন্যকে বুকে টানিয়া লওয়া, প্রাণে প্রাণে মিশাইয়া লওয়া। রাগ নাই, দ্বেষ নাই, শুধু প্রেম। শুধু আনন্দ। যাঁহারা আলিঙ্গনের পরিবর্ত্তে চুম্বন ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাদের সেই চুম্বনে ঈদৃশ উদার, মধুর ও বিশুদ্ধ ভাবের প্রকাশ হয় কি না, বলিতে পারি না।

দুর্গোৎসব সাধনার সার, কর্ম্মীর প্রধান কর্ম্ম এবং ভক্তগণের ভক্তি ও প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ, কিন্তু কাল ধর্ম্মে এই পবিত্র সাধনার মধ্যেও পাপের কালিমা নিপতিত হইয়াছে, কাহারও দোষ নাই, "কালস্য কুটিলা গতিঃ।"

অনন্তকাল ধরিয়া, পৃথিবীর উপরে শেফালিকা-সুরভিত শরৎ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব তিরোভাব হইতেছে, যুগযুগান্ত হইতে নবনারী মুখে দশভুজার আগমনী-সঙ্গীত উদ্গীত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু হৃদয়ের সে সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি হইল কৈ? মেঘের আবরণ হইতে আকাশ কখনও উন্মুক্ত হইল না। শান্ত প্রফুল্ল শরদের বিশদ জ্যোতিও কভু প্রকাশিত হয় নাই, শুধু বর্ষার দুর্দ্দিন, ঘোর অন্ধকার ও অশ্রুপাত! সুতরাং শেফালিকা আর বিকশিত হইতে পারিল না, সে শরৎ যেন কত দূরে ও দূরাতিদূরে অবস্থিত। অতএব সেই মাতৃকৃপা মহাশক্তির আগমনী সঙ্গীতও আর পরিশ্রুত হইল না, সে শুভদিনের মঙ্গল-বাঁশরী আর বাজিল না, একে একে দিনগুলি ফুরায়ে গেল, শেষদিনের গোধূলীতে কর্ম্মনাশাকূলে ক্লান্ত-কলেবরে দাঁড়িয়ে ওপারে মঙ্গল আরতির মধুর মৃদঙ্গধ্বনি শুনিতেছি, সে যেন কত দূরে, মধ্যখানে কল-কলায়মান তরঙ্গ-শালিনী প্রকাণ্ড নদী! সুতরাং এবারের মত কল্পনার কুসুমাঞ্জলি মহাশক্তি দশভুজার চরণাম্বুজে উদ্দেশে প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি।

"সর্ব্ব মঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি, নারায়ণি নমস্তুতে॥

শান্তিঃ

শ্রীঅনঙ্গমোহন চৌধুরী।

---

# প্রসাদী ফুল। (৪)

শেখা-ধর্ম্ম ও ফোটা-ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীগুরুদেব "শেখা-ধর্ম্ম ও ফোটা-ধর্ম্ম", এই দুইটী শব্দ অনেক সময় ব্যবহার করিতেন। বাজিকরেরা এক দণ্ডের মধ্যে একটা বৃক্ষ উৎপন্ন করে, অল্প সময়ের মধ্যেই সেই বৃক্ষ ফুলে ফলে সুশোভিত হয়, কিন্তু

পলকের মধ্যে উহা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সেইরূপ কল্পনার মায়া-বলে নানা প্রকারের ভাবুকতার বৃক্ষ অল্প সময়ের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারে, কিন্তু উহার কিছুই স্থায়ীত্ব নাই। প্রকৃত বীজ হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, উহা আলো, বাতাস, মাটী ও জলের সাহায্য পাইয়া স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠে। বাজিকরের মায়া-সৃষ্ট বৃক্ষের ন্যায় উহা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হয় না। শেখা ধর্ম্ম ও ফোটা-ধর্ম্মের মধ্যেও এইরূপ প্রভেদ।

কোন এক ভদ্রলোকের দুইটী পুত্র ও দুইটী কুকুর ছিল। তিনি বিদেশে গমন কালে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একটী কুকুর দিয়া বলিলেন, "দেখ, কুকুর পরম উপকারী ও বিশ্বাসী জন্তু, দিনে অনুগত সহচর, রাত্রিতে বিশ্বস্ত প্রহরী, বিপদে সহায়, সম্পদে সুখী, কুকুরের মতন আর কোন জন্তু নাই।" এইরূপে কুকুরের অনেক গুণ বর্ণনা করিলেন এবং পালিত কুকুর কেমন করিয়া প্রভুকে রক্ষা করার জন্য নেকড়িয়া বাঘের হাতে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল, ইত্যাদি ইতিহাস অনেক করিয়া বলিলেন, পরে এই আদেশ দিলেন যে "তুমি এই কুকুরকে ভালবাসিও।"

উক্ত ভদ্রলোক দ্বিতীয় পুত্রকে ডাকিয়া দ্বিতীয় কুকুরটী তাহাকে অর্পণ করিয়া শুধু এই আদেশ করিলেন যে, "দেখ বৎস, তুমি আমার অনুপস্থিত কালে এই কুকুরটীকে দুবেলা আহার করাইবে।" কুকুরের গুণের কথা কিম্বা কুকুরের জাতির সৎকার্য্যের ইতিহাস তাহাকে কিছুই বলিলেন না।

কয়েক মাস পরে পিতা যখন বিদেশ হইতে ঘরে ফিরিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন, বড় পুত্রের সহিত তাহার কুকুরের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র তাহার কুকুরের প্রতি অত্যন্ত মমতাশীল হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতৃ-মুখশ্রুত কুকুরের গুণের কথা দুই চারিদিন মনে রাখিয়াছিল, কিন্তু উহা তাহার হৃদয়ের উপর কিছু মাত্র কার্য্য করে নাই, সেই উপদেশ দুই চারিদিনেই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র যখন দুইবেলা কুকুরটীকে আহার দিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে তাহার কুকুরটীর প্রতি মমতা জন্মিল, তখন সে উহাকে স্নান করাইত, সঙ্গে করিয়া বেড়াইত এবং অত্যন্ত ভালবাসিত। যদিও পিতা কনিষ্ঠ পুত্রের নিকট কুকুরের কিছুমাত্র গুণ বর্ণনা করেন নাই এবং উহাকে ভালবাসিতে তাহাকে অনুরোধ করেন নাই, তথাপি স্বাভাবিক নিয়মে কর্ম্মের মধ্য দিয়া ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিল, আর "ভালবাসিতে হইবে, ভালবাসিতে হইবে" এরূপ চিন্তার মধ্য দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের মোটেই ভালবাসার বিকাশ হইল না। সে ব্যক্তি দুই চারিদিন যে কুকুরের প্রতি মনোযোগ রাখিয়াছিল, তাহা তাহার "শেখা ধর্ম্ম", আর দ্বিতীয় পুত্রের কর্ম্মের মধ্য দিয়া যে মমতা ফুটিয়া উঠিল, উহারই নাম "ফোটা ধর্ম্ম।"

"এস আমরা আমরা সকলে মিলিয়া ভগবানকে ভক্তি করি" এরূপ বাক্য সহস্র সহস্রবার বলিয়াও কেহ ভক্তিলাভ করিতে পারে না। "সর্ব্বত্রই ঈশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন" পুনঃ পুনঃ এরূপ চিন্তা করিলে চারিদিকে ঈশ্বরের বিদ্যমানতা অনুভবের চেষ্টা কাল্পনিক ধর্ম্ম অথবা শেখা ধর্ম্ম। উহা দুই চারিদিনের জন্য কোন অদৃশ্য পুরুষের একটা কাল্পনিক সত্তা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইতে পারে, কিন্তু উহা দ্বারা প্রকৃত ব্রহ্মসত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় না। আচরণের মধ্য দিয়া যে ধর্ম্ম ফুটিয়া উঠে, উহাই ফোটা

ধর্ম্ম। শ্রীগুরুদেব বলিয়াছেন "যাহা সত্য, তাহা নিত্য, একবার প্রকাশিত হইলে তাহা আর কখনও বিলুপ্ত হয় না। বীজ হইতে অঙ্কুর একবার নির্গত হইলে উহা যেমন আর বীজে প্রবিষ্ট হয় না, সেইরূপ, সত্য বিশ্বাস একবার উৎপন্ন হইলে উহা আর নষ্ট হয় না।"

কোন বন্ধ্যা স্ত্রীলোক পরের মুখে শুনিয়া কিম্বা গ্রন্থে পাঠ করিয়া অপত্য-স্নেহ লাভ করিতে পারে না। অপরের সন্তানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতে পারে, কিন্তু উহা কদাচ অপত্য-স্নেহ নহে। যত দিন সে সন্তানের মুখ দর্শন না করিবে, তত দিন কিছুতেই অপত্য-স্নেহ অনুভব করিতে পারিবে না। যে বস্তুর সন্দর্শনে হৃদয়ের যে ভাবটী বিকশিত হয়, সেই বস্তুর অভাবে অন্য সহস্র প্রকার চেষ্টা দ্বারাও সে ভাব কখনই ফুটিবে না।

চিন্তা করিয়া কিম্বা পরের নিকট শিক্ষা করিয়া যেরূপ অপত্য-স্নেহ জন্মেনা, সেইরূপ দাম্পত্যপ্রেম, পিতৃ-মাতৃ ভক্তি, ভ্রাতৃ স্নেহ, বন্ধু-বাৎসল্য, স্বদেশানুরাগ, স্ব-জাতি-প্রেম, বিনয়-নম্রতা, দয়া উপচিকীর্ষা, এমন কি, ঈশ্বর-বিশ্বাস ও দেবতার ভক্তি, ইহার কোনটীই শুধু চিন্তার সাহায্যে উৎপন্ন হয় না, সাময়িক ভাবে যদিবা চপল-চমকের ন্যায় কোন শুভযোগে দেখা দেয়, কিন্তু তাহা কখনও স্থায়ী হয় না, কেন না, উহা ফোটা ধর্ম্ম নহে, শেখা ধর্ম্ম।

উপদেশ দ্বারা লোকের মনে কোন একটা ভাবের ছায়া কিছু কালের জন্য উৎপন্ন করা যায়, কিন্তু বাত্যা-বিতাড়িত জলাশয়ের তরঙ্গ-মালা যেমন ঝটিকার সঙ্গে বিলুপ্ত হয়, সেই রূপ, উত্তেজনার অবসানে পূর্ব্বোক্ত ভাবও বিলীন হইয়া যায়। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের প্রভাব অধিকতর কাল স্থায়ী হয় বটে, কিন্তু উহাও চিরস্থায়ী হয় না, আচরণ ও তপস্যার মধ্য দিয়া যাহা বিকশিত হয়, তাহাই চিরস্থায়ী হয়, এবং তাহারই নাম ফোটা ধর্ম্ম।

একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস নবদ্বীপ-দস্যু জগাই মাধাইকে দুই দিন হরি নাম শুনাইলেন। দ্বিতীয় দিবসে মাধাই কলসীর কাণা নিক্ষেপ করিয়া নিত্যানন্দের মাথা ফাটাইল, ক্ষমার অবতার দয়াময় নিত্যানন্দ রক্তাক্ত কলেবরে মাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন, "মেরেছ কলসীর কাণা, তাই বলে কি প্রেম দিব না?" এই অদ্ভুত দৃষ্টান্ত, উপদেশ দান অপেক্ষা অধিকতর কার্য্য করিল। নিত্যানন্দের ব্যবহারে জগাই স্তম্ভিত হইয়া গেল, তাঁহার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইল। যে সকল সুকোমল মানসিক বৃত্তি দুরন্ত দুষ্প্রবৃত্তি সমূহের চাপে পড়িয়া মৃতপ্রায় হইয়াছিল, পলকের অবকাশে তাহারা প্রবল বেগে আসিয়া হৃদয়-রাজ্য অধিকার করিয়া ফেলিল, শুষ্ক মরু-ভূমিতে অন্তঃসলিলা ভোগবতী-গঙ্গার আবির্ভাব হইল। জগাই বলিল, "নিতাইরে, আর মেরোনা মাধা ভাই, মার খেয়ে যে প্রেম বিলায় এমন প্রেমিক দেখি নাই।" মাধাইও নিত্যানন্দের আলিঙ্গনে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। বৃশ্চিক দংশনের জ্বালার ন্যায় উভয় ভ্রাতা অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহার পর যদি প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া সাধন প্রদান না করিতেন, তবে এই সাময়িক অনুতাপ দীর্ঘ দিন কার্য্যকরী হইতে পারিত না। সম্ভবতঃ উহা ন্যাকড়ার আগুনের মতন কিছু কাল দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া অচিরে নিবিয়া যাইত। উপযুক্ত প্রণালী প্রাপ্ত না হওয়ায় কত শত শত-

ব্যক্তির হৃদয়ের ধর্ম্মাগ্নি নিবিয়া গিয়াছে। আচরণের মধ্য দিয়া, সহজ ভাবে বলিতে গেলে তপস্যার-মধ্য দিয়া যাহা বিকাশ প্রাপ্ত হয়, তাহাই ফোটা ধর্ম্ম এবং উপদেশ শুনিয়া ও দৃষ্টান্ত দেখিয়া হৃদয়ে যে একটা সদ্ভাবের সঞ্চার হয়, উহা শেখা ধর্ম্ম।

যাঁহারা আমাদের দেশের সাধু সন্ন্যাসী-দিগের সঙ্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আচরণের মধ্য দিয়া ধর্ম্মকে ফুটাইয়া তোলাই এদেশীয় সাধনার প্রকৃষ্ট প্রণালী। কতকগুলি উচ্চ তত্ত্ব মুখস্থ করিলে ধর্ম্ম লাভ হয় না, উপযুক্ত আচরণের মধ্য দিয়া উচ্চ তত্ত্ব সাধকের প্রাণে আপনি ফুটিয়া উঠে। অন্ধ ব্যক্তির নিকট প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিলে সে সৌন্দর্য্য সে ব্যক্তি কিছুই অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু কোন মহৌষধি বলে যদি তাহার চক্ষুদান করা যায়, তবে বর্ণনা করিয়া না বুঝাইলেও সে ব্যক্তি প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে সক্ষম হয়।

যিনি এইরূপ চক্ষুদান করিতে পারেন, যিনি অভিজ্ঞ ও উৎকৃষ্ট মালীর ন্যায় বীজ হইতে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর করিয়া বৃক্ষকে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনি সদ্‌গুরু, তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দান করেন, সেই ধর্ম্ম ফোটাধর্ম্ম, আর চিন্তা উপদেশ ও দৃষ্টান্তের মধ্য দিয়া যে সাময়িক ভাব উৎপন্ন হয়, উহা "শেখা ধর্ম্ম।"

শ্রীমনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

# শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মোৎসব।

অসীম কৌশলময় জগন্নির্ম্মাতা করুণা-ময়ের শান্তিময়-রাজ্যে প্রাকৃতিক নিয়ম বশতঃ যখন কোন পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হয়, তখন জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুর অন্তরে অন্তরে অলক্ষ্যভাবে যেন এক মহান্ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। এই সূক্ষ্ম জগতের ঈদৃশ বিশাল সংঘর্ষের অপ্রতিহত বেগে স্থূল জগতের নিয়ন্ত্রি-শক্তিও নানারূপে বিশৃঙ্খল হইয়া থাকে, ঐ বিশৃঙ্খলতার ফলে রজস্তমের উপচয় বশতঃ শান্তির রাজ্যকে অশান্তি-পিশাচের রঙ্গভূমি করিয়া তুলে।

তদানীন্তন মনুষ্যগণের নিরন্তর কদাচরণের দ্বারা পাপভার-পীড়িত ধরণী, তাদৃশ দুর্ব্বৃত্ত-গণের দুর্ব্বহভার বহনে অসমর্থ বশতঃ রসা-তলে যাইবার উন্মুখ হইলে, জগদ্ধিতৈষী মহানুভব দেবঋষিগণের স্তবে সন্তুষ্ট ভগবান নারায়ণ ভূভার হরণের নিমিত্ত যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। বহুকালিক যাগ-যজ্ঞাদি-বিশোধিত দান-ধর্ম্ম-প্রধান অবনী-মণ্ডলে পুণ্যবানদিগের গৃহে স্বীয় অসাধ্য সাধনী শক্তি যোগমায়াও সাঙ্গ-পাঙ্গের সহিত মায়িক জন্ম পরিগ্রহ করেন। উপাসকের উপাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত, অধর্ম্মের নিবারণ ও ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের নিমিত্ত, দুষ্টের দণ্ডবিধান ও শিষ্টের পালনার্থ, অসাধুর বিনাশ ও সাধুর রক্ষার্থে, ফলতঃ প্রলয়সাগর-নিমজ্জ-নোন্মুখ জগতে প্রকৃতির সর্ব্ববিধ সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ভগবানের আবির্ভাব। এই রূপে তিনি যে সময়ে এই অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন, সেই অনন্ত কল্যাণময়ের আবির্ভাব-তিথির স্মরণ ও অর্চ্চনার্থ আর্য্যশাস্ত্রের নানা-

রূপ বিধি ব্যবস্থা উল্লিখিত হইয়াছে। মহাপুরুষের জন্মতিথি অপার মাহাত্ম্যে পরিপূর্ণ,—আনন্দময়ের জন্মোৎসব অপরিসীম আনন্দপ্রবাহে প্রবাহমান। তাই আজ সেই আনন্দবার্ত্তা ভক্তজগতে প্রচারের জন্য প্রকৃতিদেবী নবসাজে সুসজ্জিত। জল, স্থল, নভোমণ্ডল, অনিল, অনল, সকলেই যেন আজ মহাপুরুষের শুভ আগমন প্রতীক্ষায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া, তাঁহার প্রীতি বিধানের জন্য নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প-আভরণে সুশোভিত হইল।

বর্ষার ও শরতের সন্ধিক্ষেত্রে, জন্মাষ্টমীর অবস্থান। প্লাবনের ও শোষণের মধ্যে, উপচয় ও অপচয়ের মিলনক্ষেত্রে, বপন ও পোষণের শেষে জন্মাষ্টমীর স্থিতি।

অম্বুবাচির পরে বীজবপন হইল ধরিত্রী সগর্ভা হইলেন, ভগবানও সেই সময়ে পূর্ণরূপে দেহধারণ করিলেন।

এইটুকুই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য।

আমাদের শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একটী নূতন কিছু আগমন করিলেই এইরূপই হয়। বাধা, বিরোধ, অত্যাচার, উৎপীড়নের মধ্যে নূতনের উদ্গম। কিন্তু সে নূতনকে রক্ষা করিতে হইলে পূর্ব্বাপর প্রসারিণী কালরূপিণী কালিন্দী পার হইয়া নন্দালয়ে গিয়া রাখিয়া আসিতে হয়। সেই জন্যই, যখন ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে নিশাকালে ঘোর দুর্যোগে কংশ-কারাগারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহ ধারণ করেন, তখন ভগবানেরই আদেশে বসুদেব নিজপুত্র ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, সেই ঘোর নিশাতে যমুনা পার হইয়া গোকুলে গমন করেন। সেই নন্দালয়ে নন্দরাণী যশোদার ক্রোড়ে সন্তান রাখিয়া আসিলেন। স্বয়ং ভবানী শিবারূপে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন, বাসুকী অনন্তদেবের ছত্র স্বরূপ হইয়াছিলেন, এবং কুলপ্লাবিনী তরল তরঙ্গিণী কালিন্দীও হঠাৎ হাঁটুজল হইয়া পার হইবার পথ দিয়াছিলেন।

সেই স্থলে—সেই গোকুলে গোপাল সঙ্গে, রাখাল সাহচর্য্যে, মধুর বৃন্দাবনে সেই নূতনটী পরিপুষ্ট হন। সে পরিপুষ্টির পক্ষে পুতনা বধ, যমলার্জ্জুন উদ্ধার, বৎসাসুর নাশ, কালীয় দমন ইত্যাদি। সে সকলই আর্য্যসন্তান মাত্রই জ্ঞাত আছেন। তৎপরে কালপূর্ণ হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কংশ বধ করেন এবং তাহার রাজ্য মথুরা অধিকার করিয়া উগ্রসেনের প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বাপর যুগের ৮৬৬৮৮০ বৎসর গত হইলে, ৮ই ভাদ্র, বুধবার, কৃষ্ণপক্ষীয় শুভ অষ্টমী তিথিতে ছচল্লিশ দণ্ড অর্থাৎ রাত্রির চতুর্দ্দশ দণ্ড গত হইলে, যখন আকাশে রোহিণী নক্ষত্র উদিত ও তাহার সহিত অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রসকল ও গ্রহগণ প্রসন্ন হইল, দিক্‌সকল শান্তভাব ধারণ করিল, গগনে বিমল তারকারাজি উদিত হইল, গ্রাম ও নগর সকলের বিবিধ মঙ্গলে পৃথিবী মঙ্গলময়ী হইলেন, নদী সকল নির্ম্মল-সলিলা, হ্রদ সকল পদ্মশোভায় সুশোভিত ও বন্যবৃক্ষে স্তবক স্ফুরণ হইল, বিহগগণ আনন্দে কূজন ও ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে লাগিল, সুখস্পর্শ পবিত্র সৌরভবাহী নির্ম্মল বায়ু বহমান হইল, দ্বিজাতিগণের নির্ব্বাণপ্রায় যজ্ঞাগ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, অসুর-নিপীড়িত সাধুগণের মন প্রসন্ন হইল, স্বর্গে দুন্দুভি সকল একতানে ধ্বনিত হইতে লাগিল, কিন্নর, গন্ধর্ব্বগণ ও সিদ্ধচারণগণ স্তব এবং বিদ্যাধরগণ অপ্সরাগণের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন, দেব ও ঋষিগণ সহর্ষে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন,

সাগরের ন্যায় জলধরগণ মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল, এই শুভ জয়ন্তী-যোগ সময়ে,পূর্ব্বদিক হইতে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের ন্যায়, কংশ-কারাগারে দেবকীর গর্ভ হইতে সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান সাক্ষাৎ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন। ভগবানের অঙ্গকান্তি দ্বারা সূতিকাগৃহ আলোকিত হইতে লাগিল। বসুদেব সদ্যজাত পুত্রের স্বরূপ অবলোকন করিয়া তাঁহাকে পরম পুরুষ জ্ঞানে কৃতাঞ্জলি পুটে স্তুতি করিতে লাগিলেন। বসুদেব বলিলেন—"ভগবন্! আপনাকে সাক্ষাৎ পরমপুরুষ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম এবং সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মারূপে জানিলাম। আপনি সর্ব্বস্বরূপ কর্ম্মব্যাপক পরমার্থ বস্তু, অতএব অসীম; সুতরাং আপনার অন্তরও নাই, বাহিরও নাই। হে বিভো! তত্ত্বদর্শিগণ বলিয়া থাকেন, আপনা হইতে এ বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে,—অথচ বিকারাদি বাহিত্য। হে জগৎসতে!—আপনি নিজ মায়া দ্বারা ত্রিলোকের পালনের নিমিত্ত শুক্লবর্ণ, সৃষ্টির নিমিত্ত রজোগুণ সংবর্দ্ধিত রক্তবর্ণ এবং ধ্বংসের নিমিত্ত তমোগুণ যোগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়া থাকেন। হে জগৎপালক! আপনি এই সমস্ত লোকের রক্ষাভিলাষে কৃষ্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং দুষ্ট অসুর রাজগণ কর্ত্তৃক ইতস্ততঃ অসৎ কার্য্যে প্রেরিত সৈন্যসকল বিনাশ করিবেন। হে সুরেশ্বর! কংশ আপনার অগ্রজদিগকে নিধন করিয়াছে, এক্ষণে অবতার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেই অস্ত্রধারণ পূর্ব্বক এইস্থানে আগমন করিবে।"

যথাঃ—

স ত্বং ত্রিলোক স্থিতয়ে স্বমায়য়া বিভর্ষি শুক্লং
খলুবর্ণমাত্মনঃ।
সর্গায় রক্তং রজসোপ বৃংহিতং কৃষ্ণঞ্চতমসা
জনাত্যয়ে ত্বমস্য লোকস্য বিভো বিবক্ষিষু—
গৃহেঽবতীর্ণোঽসি মমাখিলেশ্বর।
রাজন্য সংজ্ঞাসুরকোটী যূথপৈ
র্নির্ব্যূহমানা নিহনিষ্যসে চমূঃ॥

অতঃপর দেবকীও নিজ সদ্যপ্রসূত সন্তানকে চতুর্ভুজ নারায়ণ জ্ঞানে স্তব আরম্ভ করিয়াছিলেন,—"হে ভগবন! বেদসকল যে ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা প্রকাশিত, যিনি বিশ্বের কারণ, সর্ব্বব্যাপক, চেতন, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, বিশ্বেশ্বর, শাশ্বত অর্থাৎ পূর্ব্বে ও পরে বর্ত্তমান দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদির প্রকাশ স্বরূপ, আপনিই সেই বিষ্ণু। কালবেগে দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে চতুর্দ্দশ ভুবন বিনষ্ট হইলে, মহাভূত পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় নিজ কারণে লীন হইলে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হইলে, প্রকাশিত বিশ্ব প্রকৃতিতে গমন করিলে, একমাত্র আপনিই অবশিষ্ট থাকেন। কিন্তু সেই আপনি আজ আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইহাপেক্ষা কি সৌভাগ্য হইতে পারে? কিন্তু হায় ইহা মনুষ্যলোকের বিড়ম্বনা।"

যথাঃ—

রূপং যত্তৎ প্রহুর বর্ত্ত্যসাদ্যং ব্রহ্ম
জ্যোতিঃনির্গুণং নির্ব্বিকারম্।
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং নিরীহং,
স ত্বং সাক্ষাদ্বিষ্ণুরধ্যাত্মদীপঃ॥
নষ্টে লোকে দ্বিপরার্দ্ধাবসানে
মহাভূতেষাদি ভূতং গতেষু।
ব্যক্তেঽব্যক্তং কালবেগেন যাতে
ভয়ানকঃ শিষ্যতেঽশেষ সংজ্ঞঃ॥

ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ও নির্দ্দেশমত বসুদেব তদীয়

সদ্যজাত নবকুমারকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া গোকুলে রক্ষা করিতে যান। সেখানে যোগমায়া আবির্ভূত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার মহামায়ায় কংশের প্রহরীগণ সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ভগবানের কৌশলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় ও বিন্দু বিন্দু বারিপাত হওয়ায় কারাগারের প্রহরীগণ গভীর নিদ্রাভিভূত ছিল, অতএব বসুদেব স্বীয় পুত্রটী যমুনার অপর পারে নন্দালয়ে অনায়াসেই রাখিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। দূর—অতিদূর—কোন্ স্মরণাতীত যুগে গোপরাজ নন্দের আলয়ে ভূতভাবন ভগবান্ নারায়ণ আবির্ভূত হইয়া পুরী পবিত্র করিয়াছিলেন। সেই অতীত যুগের শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসবে নন্দযশোদার অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র এক অনন্ত আনন্দের এক অনন্ত স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই সাধের মুহূর্ত্ত, সেই প্রাণ-প্রহ্লাদিনী উৎসব-লীলা, সেই সাধের আনন্দোচ্ছ্বাস, এখনও পৃথিবী আনন্দে হৃদয়ে পূরিয়া রাখিয়াছে। পাপের সহস্র কশাঘাতে, দুঃখের অজস্র আক্রমণে, দৈন্যের প্রচণ্ড প্রতাড়নে হৃদয়ের সমস্ত স্তর ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তথাপি আজও আমরা সেই সাধের স্মৃতি অতি সন্তর্পণে আমাদের হৃদয়ে পূরিয়া রাখিয়া পরিতুষ্ট হইয়া আছি—এখনও পরিত্যাগ করি নাই—বুঝি কখনও সেই স্মৃতি ছাড়িতে পারিব না। তাই আর্য্যসন্তানগণ প্রতিবর্ষেই জন্মাষ্টমী ব্রত করেন।

এ বৎসর অর্দ্ধরাত্রি অষ্টমী তিথি এবং রোহিণী নক্ষত্রে মিলিত হইয়াছে; এ জন্য মহাযোগ হইয়াছিল। ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে রোহিণী নক্ষত্র যোগে এবং কলির অষ্টবিংশতি পরিমিত যুগে, অর্দ্ধরাত্রে, দেবকী গর্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

যথা :—অথ ভাদ্র পদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে।

অষ্টমাবিংশতি মে জাতঃ কৃষ্ণোঽসৌ দেবকীসুতঃ॥

ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—"হে কুরুনন্দন, এই জন্মাষ্টমীতে একটী মাত্র উপবাস করিলে লোকে সপ্ত জন্মকৃত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই"। এই জন্মাষ্টমী ব্রত স্ত্রী পুরুষ সকলেরই অনুষ্ঠেয়। ইহা সন্ধ্যা বন্দনা বা উপাসনাদির ন্যায় নিত্য কর্ম্ম। আবার এই জন্মাষ্টমী ব্রত পালন করিলে নানারূপ ফল লাভ হয়, সুতরাং ইহা কাম্য কর্ম্ম বলিয়াও পরিগণিত।

একেনৈবোপবাসেন কৃতেন কুরুনন্দন।
সপ্ত জন্ম কৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

শাস্ত্রকারগণ ভূয়ঃ ভূয়ঃ বলিয়াছেন যে, জন্মাষ্টমী দিবসে সকলেরই উপবাস করা কর্ত্তব্য। গৃহিগণ পূর্ব্বকালে গুরুগৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়া ভগবান শ্রীগুরু কৃপায় প্রসাদ গ্রহণ করিয়াই ব্রত সমাপ্ত করিতেন। উপ অর্থে নিকটে, আর বাস অর্থে অবস্থান করা। অতএব উপবাস করার সম্পূর্ণ অর্থ গুরুর কাছে থাকা। তাই তৎকালে গুরুস্থানে গুরু গৃহে অবস্থান করিয়া প্রসাদ লাভ করতঃ উপবাস সিদ্ধ করিতেন। কিন্তু আজ কালকার দিনে সকলের ভাগ্যে সে সুযোগ ঘটে না বলিয়া গৃহিগণ অর্দ্ধরাত্রে বিধি পূর্ব্বক ভগবানের পূজা বসুধারা প্রদান এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ভাবনা করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করেন।

এই জন্মাষ্টমী তিথিতে তীর্থস্নান ও পিতৃতর্পণাদি করিলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয়। তাই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে,—

"মন্বন্তরাদি কালে স্নান পূজাদি দ্বারা যে ফল লাভ হয়, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীতে স্নান পূজাদি অনুষ্ঠান করিলে তার কোটিগুণ ফল লাভ হয়। এতএব জন্মাষ্টমীর পবিত্র দিনে যে ব্যক্তি পিতৃলোকদিগের উদ্দেশ্যে বারিমাত্রও প্রদান করেন, শত বর্ষব্যাপী গয়াশ্রাদ্ধ করিলে যে ফল প্রাপ্তি হয়, তাঁহার তাহাই লব্ধ হইবে, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

এখানে একটী আনন্দবার্ত্তা পাঠকবর্গকে দিতেছি, তাহা অতি পবিত্র,—যাঁহারা কলিকাতা সনাতন ধর্ম্ম-প্রসারিণী সভার উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন, সভাচার্য্য শ্রীমন্মহর্ষি নগেন্দ্রনাথ ভাদুড়ী মহোদয়ের যত্নে ও অর্থব্যয়ে তথায় কিরূপ পবিত্র প্রেমোদ্দীপক মহোৎসবে ভক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল, এবং এই জন্মাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে তিনি যে দীন দুঃখী কাঙ্গালীকে সুভোজ্যে পরিতৃপ্তি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাহা বলিতে পারেন। আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া উক্ত মহাত্মার উৎসবানন্দে যোগদান করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম।

সে যাহা হউক, এক্ষণে পাঠকবর্গ সমীপে আমার নিবেদন এই যে, আখ্যানটীর একবার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি করুন। যিনি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের আদি-কারণ, কূটস্থ চৈতন্যরূপে সকল জীবের অন্তরে ও বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মতত্ত্বে আপন আপন দেহতত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, ইহার অতীব সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম গভীর তত্ত্ব স্ব স্ব দেহমধ্যে নিহিত রহিয়াছে। এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ভবিষ্যতে করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীউপেন্দ্রমোহন চৌধুরী কবিভূষণ।

# বৈষ্ণব প্রবন্ধের "পরিশিষ্ট"।

বিগত ১৩০৯ সন হইতে এ পর্য্যন্ত নব্যভারতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবি ও পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে আমি যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছি, তদ্বিষয়ে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক। ঐ সমস্ত প্রবন্ধ মধ্যে যে যে ভ্রম প্রমাদ আছে, আমি এখানে তাহার সংশোধন করিব। প্রবন্ধ প্রকাশের পরে অনুসন্ধান করিয়া যাহা যাহা আবার নূতন জানিতে পারিয়াছি, তাহাও প্রকাশ করিব। এতদ্ভিন্ন যে কতকগুলি মুদ্রাকর প্রমাদ আছে, তাহারও বিশেষ দুই একটী এখানে সংশোধন করা হইবে। সুধী পাঠকগণ, ইহা আমার প্রবন্ধ সমূহের "পরিশিষ্ট" বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন।

প্রথমেই আমার বক্তব্য এই,—আমি কোন প্রকার প্রবাদ বাক্যের কিম্বা "জাল" গ্রন্থের আশ্রয় গ্রহণ করি নাই। বিশ্বস্ত সূত্রে যাহা অবগত হইয়াছি, এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ পত্রে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাই অবলম্বন করিয়া আমার এই সমস্ত প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের আদর রক্ষা করা, আমার প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য নয়। সরল ভাবে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাই লিখিয়াছি।

স্বীকার করি,—প্রবাদ বাক্যের দ্বারা সময় সময় ঐতিহাসিক সত্য লাভ হয়। কিন্তু অপধর্ম্ম-প্রবল বঙ্গদেশের নানা স্থানে দুষ্ট মতাবলম্বিগণ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিবিধ প্রবাদ বাক্যের সৃষ্টি হইতেছে। সুতরাং

তাহা গ্রহণ করা, আমি সঙ্গত মনে করি নাই, "জাল গ্রন্থ" সম্বন্ধে পরে একটুকু বিশদ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীলোচনদাস ঠাকুর।

( সন ১৩০৯ ভাদ্র সংখ্যা )

নব্যভারতে একটীই আমার প্রথম বৈষ্ণব প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে ভ্রম ক্রমে "শ্রীলোচন দাস" ও "সুলোচন দাস" এই দুই মহাত্মাকে অভিন্ন বলিয়া বর্ণন করিয়াছিলাম। পরে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়া বিগত ১৩১৩ সনের আষাঢ় মাসে "মহানুভব শ্রীলোচন দাস ঠাকুর" নামক একটী বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে।

পরম ভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস।

( সন ১৩০৯ অগ্রহায়ণ সংখ্যা )

কবিরাজ গোস্বামী,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ মধ্যে তিনি এসম্বন্ধে উল্লেখ না করিলেও, নিম্নলিখিত কারণে ইহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যায়।

বৈষ্ণব শাস্ত্রমতে শ্রীনিত্যানন্দ,—ভগবানের বিলাস মূর্ত্তি। গুরু, প্রকাশ মূর্ত্তি। নিত্যানন্দ বিলাস মূর্ত্তি হইলেও, তিনি তাঁহাকে ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যথা চরিতামৃতে—

"নিত্যানন্দ রায়, প্রভুর স্বরূপ প্রকাশ।
তাঁহার চরণ বন্দ, যাঁর মুই দাস॥
* * * *
যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহারি প্রকাশ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় চরিতামৃতের যে সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে এই—"প্রকাশ" শব্দের—"গুরুত্বেনৈব প্রকাশত্ব মিতি" এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীনিত্যানন্দ যখন স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়া কৃষ্ণ দাসকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ করেন, বোধ হয়, সেই সময় তাঁহাকে ইষ্ট মন্ত্রও প্রদান করিয়াছিলেন। বিষয়টী অত্যন্ত গোপনীয় বলিয়া তিনি তাহা প্রকাশ করেন নাই।

শ্রীগোবিন্দ-লীলামৃত, চৈতন্যচরিতামৃত, সারঙ্গরঙ্গদা-টীকা ব্যতীত শ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম ও রসমঞ্জরীস প্রার্থনাষ্টকম্—কবিরাজ গোস্বামীর রচিত এই দুইটী সংস্কৃত স্তোত্র আছে। এতদ্ভিন্ন তিনি কতকগুলি মধুর পদও ( ১ ) রচনা করিয়াছিলেন। পদকল্পতরু ও পদরত্নলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

ভক্তকবি শ্রীবৃন্দাবন দাস।

( সন ১৩০৯ পৌষ সংখ্যা )

এই প্রবন্ধের ৪৯৪ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ১৩ পংক্তিতে যে "শ্রীনরোত্তম ঠাকুর" লিখিত আছে, তৎস্থলে "শ্রীদেবকী নন্দন দাস ঠাকুর" হইবে।

সম্প্রতি চৈতন্য-ভাগবতের পরিশিষ্ট বলিয়া শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী যে কয়েক অধ্যায় ( ২ ) প্রকাশ করিয়াছেন, নব প্রকাশিত এই পরিশিষ্টাংশের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে অনেকেই আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

পরিশিষ্টাধ্যায় পাঠ করিয়া, ইহার ভাষা ও বর্ণিত বিষয় দৃষ্টে, ইহা বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের

( ১ ) বৈষ্ণব-সাহিত্যে কৃষ্ণ দাস নামে বহু ব্যক্তির উল্লেখ দেখা যায়। কৃষ্ণ দাস ভণিতা-যুক্ত পদ সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্‌টী কৃষ্ণ দাস কবিরাজের, আর কোন্ কোনটীই বা অপর কৃষ্ণ দাসগণের, তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর। প্রবন্ধ-লেখক।

(২) পরলোকগত হারাধন ভক্তিনিধি "নিত্যানন্দ-বংশ-মালা". নামক একখানা গ্রন্থ চৈতন্য-ভাগবতের পরিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। প্রবন্ধ-লেখক।

রচনা বলিয়া আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই (৩)।

(৩) প্রথমে, ভাষাটী নিতান্তই তরল, চৈতন্য-ভাগবতের অনুরূপ নহে। আর ইহাতে এমন সব বিষয় রহিয়াছে, চৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তি-রত্নাকর প্রভৃতি প্রামাণ্য গ্রন্থের বর্ণনার সহিত, এমন কি, চৈতন্য ভাগবতের সঙ্গেও যাহার সামঞ্জস্য নাই। পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভাগবতে তাঁহার মাতা নারায়ণী দেবীকে শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু এই পরিশিষ্টে নারায়ণী দেবী শ্রীবাসের নন্দিনী বলিয়া বর্ণিত।

নির্দ্দিষ্ট বিশেষ কোন কারণে সমগ্র চৈতন্য-ভাগবতে "রাধা" নামের উল্লেখ নাই। কিন্তু এই পরিশিষ্টে "রাধা" শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

চৈতন্য-ভাগবত সম্বন্ধে চরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে—

চৈতন্য চন্দ্রের লীলা অনন্ত অপার।
বর্ণিতে বর্ণিতে গ্রন্থ হইল বিস্তার॥
বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হইল মন।
সূত্রগৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন।
নিত্যানন্দ-লীলা বর্ণন হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ॥

অর্থাৎ গ্রন্থ অত্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, বৃন্দাবন দাস বর্ণন করিবেন বলিয়া সূত্রে উল্লেখ করিয়াছিলেন, এমন কোন কোন লীলা বর্ণন করেন নাই। আর নিত্যানন্দ-চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া এমনই আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, চৈতন্য প্রভুর শেষ লীলা বর্ণন করিতে পারেন নাই।

এ সম্বন্ধে ভক্তির ত্নাকরেও লিখিত আছে—

প্রভু লীলা বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন।
দক্ষিণ ভ্রমণ আদি না কৈল বর্ণন॥
ব্যাসরূপ তেঁহো, তাঁর কে বুঝে আশয়।
"পশ্চাৎ বর্ণিব বেদব্যাস" ঐছে কয়॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁরে দৈন্য করি।
দক্ষিণ ভ্রমণ আদি বর্ণিল বিস্তারি॥

কিন্তু এই পরিশিষ্টে প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ, বৃন্দাবন গমন, এমন কি, অন্তর্ধান লীলা পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ-লেখক।

পদকর্ত্তা শ্রীঘনশ্যাম।

(সন ১৩১১) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা)

ঘনশ্যাম তদীয় শ্রীগৌরচরিত চিন্তামণি গ্রন্থে আত্ম পরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

নিজ পরিচয় কত দেয়ব
শ্রীমৎ গৌড় দেশ,
সুর সরীত তটে বিনিবাস,
বিপ্রকুল জাত যুজনক জগন্নাথ,
প্রিয় বৈষ্ণব দত্ত নাম যুগ
নব হরি ঘন শ্যাম ইতি প্রথিত।

এ পর্য্যন্ত ঘনশ্যামের যে কয় খানা গ্রন্থ দেখিয়াছি, প্রত্যেক গ্রন্থেই তাঁহার নিজ পরিচয় সম্বন্ধে কিছু না কিছু লিখিত আছে। নরোত্তম-বিলাসের শেষে, এই আত্ম পরিচয় বর্ণনা কিছু বিশদ ভাবে ও কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী। এত বিস্তৃত বলিয়াই বোধ হয়, নরোত্তম-বিলাসের এই অংশটীকে তিনি "নরোত্তম-বিলাসান্ত" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১১২ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ১৩ পংক্তিতে "শ্রীরাম চরণ" স্থলে 'শ্রীরাধা রমণ" হইবে।

বৈষ্ণব-কবি শ্রীমালাধর বসু।

(সন ১৩১১ মাঘ সংখ্যা)

৫১৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে ১৭ পংক্তিতে "লক্ষ্মীনাথ বসু" স্থলে "লক্ষ্মীধর বসু" হইবে।

প্রাচীন কবি শ্রীরঘুনাথ।

(সন ১৩১২ চৈত্র সংখ্যা)

৬২৯ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে ৫ পংক্তিতে "১৪৩৫ শকাব্দা" স্থলে "১৪৩৬ শকাব্দা" হইবে।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী।

(সন ১৩১৪ শ্রাবণ ও মাঘ সংখ্যা)

চৈতন্য-চন্দ্রোদয়-কৌমুদী গ্রন্থে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সাধন সম্বন্ধীয় একটুকু পরিচয়

পাওয়া যায় (৪)। তিনি দশাক্ষর যুগল মন্ত্রের উপাসক ছিলেন যথা—

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পরম মহান্ত
দশাক্ষর মন্ত্র হাঁর উপাস্য একান্ত॥
সেই মন্ত্র দিলা তিঁহ ঈশ্বর পুরীরে।
মন্ত্র পাইয়া সেহোঁ প্রেম-সমুদ্রে বিহরে॥

এতদ্ভিন্ন আমার অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বক্তব্য নাই। (৫)

## জাল সাহিত্য।

আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয়ত কৃত্রিম মুদ্রা দেখিয়া থাকিবেন। জাল নোট ও জাযগা জমীর জাল দলিলাদির কথাও বোধ হয় সকলের জানা আছে। কিন্তু গ্রন্থ যে জাল হয়, সে বৃত্তান্ত বোধ হয় অনেকেই জানে না এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক। আজ আমরা এখানে বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহের জাল ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৪৫৫ শকে অন্তর্হিত হয়েন। প্রাচীন বৈষ্ণব ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রভুর অন্তর্ধানের পরেও প্রায় এক শত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিশুদ্ধ প্রণালীতে অনুষ্ঠিত ও প্রচারিত হইতেছিল। ইহার পর হইতেই এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নেড়া-নেড়ী, আউল বাউল, সহজ ভজন, কিশোরী ভজন, রসের সাধন, পীরিতের সাধন প্রভৃতি নানা প্রকার অপধর্ম্মের সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রচারিত ধর্ম্ম অতি পবিত্র ও কঠোর বৈরাগ্য ভাবাপন্ন। আর এই সমস্ত অপধর্ম্ম, স্ত্রীলোক-ঘটিত নানা প্রকার অকথ্য ব্যভিচারে পরিপূর্ণ। অপ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনকারীরা কিন্তু—"ইহাই প্রকৃত গৌরধর্ম্ম"—বলিয়া তাহা জনসমাজে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। আর তাহা সমর্থনার্থ কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করি-য়াছিল।

নিজ নামে গ্রন্থ লিখিলে, ঐ গ্রন্থ কিম্বা গ্রন্থোক্ত ধর্ম্ম, জনসমাজে গৃহীত হইবে না। তাই তাহারা গ্রন্থ মধ্যে নিজের নাম ও পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখিল। কেহ মহা-প্রভুর ভৃত্য, কেহবা কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য পরিচয় দিয়া, আর কেহবা শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস, শ্রীলোচনদাস, শ্রীরূপ গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতির নাম, ভণিতা ও তৎসাময়িক সন, তারিখাদি ব্যবহার করিয়া,—গ্রন্থ প্রকাশ করিল। এই প্রকারে প্রাচীন গ্রন্থকার-গণের নামে যে কত জাল গ্রন্থের সৃষ্টি হই-য়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

অধুনা সাহিত্যসেবিগণের যত্নে ও অনুসন্ধানে বিলুপ্তপ্রায় বহু প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়া, সাহিত্য-সম্পদ দিন দিন

---

(৪) চৈতন্য-ভাগবতে লিখিত আছে,—মাধবেন্দ্র-শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী "কৃষ্ণ-লীলামৃত" নামক এক-খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থ দর্শন আমার ভাগ্যে এ পর্য্যন্ত হয় নাই। উহার মধ্যে মাধবেন্দ্র সম্বন্ধে কোন বিবরণ থাকিতে পারে। আমাদের সাহিত্যসেবকগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণলীলা-মৃতের সন্ধান বলিয়া দিলে আমি একান্তই অনুগৃহীত হইব। প্রবন্ধ-লেখক।

(৫) নব্যভারতে,—সন ১৩১০ আশ্বিন সংখ্যায় মহানুভব শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর, সন ১৩১৭ আশ্বিন সংখ্যায় প্রাচীন কবি শ্রীবিজয়গুপ্ত, সন ১৩১৮ আশ্বিন সংখ্যায় শ্রীমৎ সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজী, প্রবাসীতে, ১৩১৪ সনের চতুর্থ সংখ্যায় মহানুভব শ্রীকবিকর্ণ পুরু গোস্বামী "বিজয় গুপ্ত" এইটী বৈষ্ণব প্রবন্ধ নহে। প্রবন্ধ-লেখক।

যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রন্থ পরিচয়ে এই সমস্ত "জাল গ্রন্থ" প্রকাশিত হইয়া সাহিত্য-ভাণ্ডার আবার তদ্রূপ আবর্জ্জনা পূর্ণও হইতেছে। (১) শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র প্রভৃতি প্রায় কেহই এই জাল সমস্যার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই।

এখানে হয়ত কেহ কেহ আমাদিগকে এই প্রশ্ন করিতে পারেন, প্রচলিত বৈষ্ণব গ্রন্থ সমূহের মধ্যে কোন্ কোন্ খানা প্রকৃত আর কোন্ কোন্ খানাইবা জাল? প্রকৃত গ্রন্থ ও জাল গ্রন্থ নির্দ্ধারণ করিবার উপায় কি?

গ্রন্থের কাগজ, গ্রন্থকারের ভণিতা, প্রতিলিপির সময় প্রভৃতি দৃষ্টে বর্ত্তমানে সাহিত্য-সেবীরা গ্রন্থের প্রাচীনত্ব যেরূপ প্রমাণ করেন, আমাদের বিবেচনায় তাহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ জালকারীগণ চির-দিনই সুচতুর। যাহারা এত চতুরতার সহিত জাল করিতে সমর্থ, তাহারা যে নিজেরাই প্রতিলিপিকার হইয়া প্রয়োজনানুরূপ সন, তারিখ দিতে না পারে, এমত নহে (২)।

কোন গ্রন্থ নূতন প্রাপ্ত হইলে, নিম্ন-লিখিত উপায়ে তাহার প্রামাণিকতা নির্দ্ধারণ করিতে আমরা পরামর্শ দেই।

১। নবাবিষ্কৃত গ্রন্থের নাম কোন প্রামাণিক গ্রন্থে আছে কি না?

২। প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহের বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে নবাবিষ্কৃত গ্রন্থের বর্ণনার সামঞ্জস্য আছে কিনা?

৩। গ্রন্থ মধ্যে মহা প্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোন কথা আছে কিনা?

৪। গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের সঙ্গে তৎসাময়িক অবস্থার সামঞ্জস্য আছে কিনা?

পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে ঘনশ্যাম দাস ঠাকুর নামই বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। শকাব্দীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাঁহার অভ্যুদয়। ঘনশ্যাম—শ্রীনিবাস-চরিত, গৌর-চরিত, গৌর-চরিত-চিন্তামণি, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তম-বিলাস প্রভৃতি যে কয়খানা গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে ভক্তিরত্নাকর এক বিরাট গ্রন্থ। ইহা বঙ্গীয় বৈষ্ণবগ্রন্থ সমূহের পরিশিষ্ট বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। চৈতন্য-ভাগবত, চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে যে সকল বৃত্তান্তের উল্লেখ নাই, ঘনশ্যাম অতি সাবধানে সেই সমস্ত ইতিবৃত্ত বিশৃঙ্খলরূপে সংগ্রহ করিয়া ইহার মধ্যে বর্ণন করিয়াছেন। আর পূর্ব্ব-তন প্রায় তাবত বৈষ্ণব গ্রন্থের নাম ও আব-শ্যকীয় নানা বৃত্তান্ত ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে বিস্তৃত বৈষ্ণব সমাজে যে যে প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, আমাদের অনুসন্ধান-ইচ্ছুক পাঠকগণের চিত্ত-সন্তর্পণার্থ, তাহার প্রধান প্রধান কয়েক খানার নাম নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

মুরারী গুপ্তের চৈতন্য-চরিতা-মৃত কাব্য, কবিকর্ণপুর গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতা-মৃত কাব্য, চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটক, গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা, স্বরূপ দামোদরের কড়চা (৩)

(১) পরলোকগত জগদীশ্বর গুপ্ত "বিবর্ত্ত বিলাস" নামক এক খানা নগণ্য গ্রন্থের উক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামীর মত মহাশয় ব্যক্তিকেও "ক্ষুদ্রচেতা" বলিয়া গালি দিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক।

(২) তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরস্পর পরস্পরের গ্রন্থও সমর্থন করিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক।

(৩) বহু দিন হইতে এই কড়চা খানার কোন

গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গীত-মাধব নাটক, নৃসিংহ কবিরাজের নবপদ্য, রাধা কৃষ্ণ গোস্বামীর সাধন-দীপিকা, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত, কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃত, যদু নন্দন চক্রবর্ত্তীর গৌরাঙ্গ-চরিত (৪), মনোহর দাসের অনুরাগবল্লী (৫)।

এতদ্ব্যতীত লোচন-দাস কৃত চৈতন্য-মঙ্গল ও প্রেমদাস-কৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় কৌমুদী, এই দুই খানা অনুবাদ গ্রন্থের কথাও এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক (৬)। চৈতন্য-মঙ্গল,— সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত কাব্যের অনুবাদ। চন্দ্রোদয়-কৌমুদী,—সংস্কৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ। মূল গ্রন্থ দুই খানার বহু শ্লোক ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত হইয়াছে বিধায়, বোধ হয়, এই অনুবাদ আর গ্রহণ করা হয় নাই।

পদ সংগ্রহ সম্বন্ধে,—রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃত-সমুদ্র, বৈষ্ণব দাসের পদ-কল্পতরু, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদা, ঘন শ্যাম দাসের গীত চন্দ্রোদয় ও গোরীমোহন দাসের পদকল্প-লতিকা,—এ কয় খানাই প্রামাণ্য সংগ্রহ (৭)।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, চূড়ামণি দাসের চৈতন্য-চরিত, ভগীরথ বন্ধুর চৈতন্য-সঙ্গীত, প্রদ্যুম্ন মিশ্রের চৈতন্য-উদয়াবলী, মুকুন্দ পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ-উদয়, বৃন্দাবন দাসের নিত্যানন্দ-চরিতামৃত, নিত্যানন্দ বংশমালা, লোচন দাসের চৈতন্য-প্রেম-বিলাস, দুর্লভ সার, ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ, হরিচরণ দাসের অদ্বৈত-মঙ্গল, কৃষ্ণ দাসের অদ্বৈত বাল্যলীলা সূত্র, লোকনাথ চক্রবর্ত্তী-কৃত সীতা ঠাকুরাণী-চরিত, হরিপ্রিয়া-কৃত কৃষ্ণমিশ্র-চরিত, নিত্যানন্দ দাসের প্রেম-বিলাস, প্রেমদাসের বংশী শিক্ষা, যদু নন্দন দাসের কর্ণানন্দ, মাধবেন্দ্র পুরীর অনন্ত-সংহিতা, মুকুন্দ দাসের আনন্দ-বল্লাবলী, গোবিন্দ দাসের কড়চা, নরোত্তম দাসের কড়চা, শ্রীজীব গোস্বামীর কড়চা প্রভৃতি নব প্রকাশিত গ্রন্থ গুলি বিশেষ সাবধানতার সহিত বিচার করিয়া যেন সাহিত্য-সমাজে গ্রহণ করা হয়।

শ্রীতরণীকান্ত চক্রবর্ত্তী সরস্বতী।

সন্ধান নাই। সম্প্রতি বটতলা হইতে "স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চা" নামে এক নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ-লেখক।

(৪) এই গ্রন্থ খানারও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছেনা। প্রবন্ধ-লেখক।

(৫) প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃত, শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামীর শ্রীমদ্ভাগবতামৃত, ললিত-মাধব, বিদগ্ধ-মাধব, উজ্জ্বল নীলমণি, দান কেলী কৌমুদী, গোপাল চম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম অপ্রাসঙ্গিক বিধায় এখানে উল্লেখ করা হইল না। প্রবন্ধ-লেখক।

(৬) গুণ রাজ খাঁন কৃত শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ও ভাগবতাচার্য্য-কৃত কৃষ্ণ-প্রেম-তরঙ্গিণী, এই দুই খানা গ্রন্থও এখানে উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ও গৌর গণোদ্দেশ-দীপিকায় কৃষ্ণ-প্রেম তরঙ্গিণীর নাম উল্লেখ আছে। এই দুই খানাও শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ বিশেষের অনুবাদ। প্রবন্ধ লেখক।

(৭) পরলোকগত হারাধন ভক্তিনিধি তাঁহার নিকট "পদসমুদ্র" নামক এক খানা গ্রন্থ আছে বলিয়া প্রকাশ করিতেন। সাহিত্যসেবিগণের মধ্যে কোন বিষয় জিজ্ঞাসু হইয়া যখনই কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, পদ-সমুদ্র হইতে দুই একটী পদ উদ্ধৃত করিয়া সেই সমস্ত প্রশ্নের তিনি সুন্দর মীমাংসা করিতেন। দুঃখের বিষয়, পদ-সমুদ্র দর্শন এ পর্য্যন্ত কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। এই বিরাট গ্রন্থ দেখিতে অনেকেই বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় এই সদুর্লভ সমুদ্র কাহারও নয়নগোচর করেন নাই। পদ-সমুদ্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেই এখন সন্দিহান হইয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক।

২। গম্ভীরনাথ স্বামী।

সুখেষ্বিকৃতচিত্তঃ দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে।
গীতা।

ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্ত্যথেতরে দুঃখ-
মেবাপিয়ন্তি॥
১০।৩ শ্বেতাশ্বরোপনিষৎ।

একবার ডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু জগদম্ম সহায়ের পুত্রের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া গোরক্ষপুর গিয়াছিলাম। গিয়াছিলাম আমরা অনেকে—হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বহু মতের বহু জাতির লোক। বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের স্বনামধন্য বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম-এ এবং তাঁহার ভ্রাতা বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী বি-এল, ডি, কালেক্টরও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মুন্সী নাগেশ্বর চৌধুরীর বাড়ীতে আমাদের তিন জনের একত্র থাকিবার জন্য বাসা হইয়াছিল। বর্ষাকালের জলকাদা সত্ত্বেও বারা গোরক্ষনাথের মন্দির দর্শন করিতে আমাদের ইচ্ছা হইল।

সাধু গোরক্ষনাথকে অনেকে মহাদেবের অবতার বলিয়া বিবেচনা করেন। গোরক্ষনাথ হইতে গোরক্ষপুরের নামকরণ হইয়াছে। গোরক্ষপুর জিলায় বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। সে স্থানের নাম তখন ছিল কুশীনগর, এখন কসৈয়া,—তহশীল দেউরিয়া ষ্টেসনের নিকট। সাধু গোরক্ষনাথের সমাধি ও শিবমন্দির সহর হইতে প্রায় ৬ মাইল দূরে। সেখানে বহু সাধু আসিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। মন্দির-সংলগ্ন ভূমিতে তাঁহাদেরও সমাধি বর্ত্তমান। নাথ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সাধুগণ আজকাল উত্তর ভারতের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত গোরক্ষনাথের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্য হইতে একজন মহান্ত নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাকে একটু ক্রীড়া কৌতুক, ভোগ বিলাস প্রভৃতি রাজসিক ভাবে মত্ত দেখিলাম। মন্দিরের সম্মুখে রাশি রাশি ত্রিশূলের বোঝা দরজার উভয় পার্শ্বে বাঁধা রহিয়াছে। অনেক সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথের নামে ত্রিশূল উৎসর্গ করিয়াছেন। অনেক গৃহীও অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বারা গোরক্ষনাথের নিকট ত্রিশূল মানত করে। মনস্কামনা পূর্ণ হইলে মন্দিরে সিন্দূর মাখা ত্রিশূল উপহার দিয়া যায়।*

সাধু গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। গোরক্ষনাথ যৌবনে অতিশয় বলিষ্ঠকায় পুরুষ ছিলেন। কিন্তু তিনি একটু সরলপ্রকৃতি ও

* চরিতাভিধান, ২৪২ পৃষ্ঠা।

বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ ও ধর্ম্মমত-প্রবর্ত্তক। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এই মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হন। ইনি মহাত্মা কবিরের সমকালীন লোক। ইঁহার বহুসহস্র শিষ্য ছিল, শিষ্যেরা ইঁহাকে গুরু গোরক্ষনাথবলিত। ইনি একজন যোগী, ইঁহার মতে যোগীরাই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইনি সার্ব্বভৌম ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সকল শ্রেণীর লোককেই ইনি স্বীয় ধর্ম্মমতে দীক্ষিত করিতেন। উঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করাতে রাজা হইতে নিঃস্ব দরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহাকে সম্মান করিতেন। ইনি গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি যোগসম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

স্থূলবুদ্ধি ছিলেন। তিনি কোন সাধু সন্ন্যাসীর নিকট ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ করিয়া শিষ্যরূপে তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। গোবক্ষনাথ কায়মনোবাক্যে ভক্তি সহকারে গুরুর সেবা করিতেন। গুরু তাঁহার উপর প্রধানতঃ গঞ্জিকা প্রস্তুতের ভারার্পণ করিয়াছিলেন। একদিন পথ চলিতে চলিতে বিশ্রামের নিমিত্ত এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া গুরু শিষ্যকে গঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিয়া অদূরবর্ত্তী নদীতে স্নান করিতে গেলেন। গোবক্ষনাথ একাগ্র চিত্তে গঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। গুরু আর ফিরিলেন না। ক্রমাগত ১২ বৎসর গঞ্জিকা টিপিয়া গোবক্ষনাথ সিদ্ধ হইলেন, তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভ হইল। তিনি গুরুর অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞান-নেত্রে দেখিলেন, গুরু তখন ঘোর সংসারী। সেইদিন নদীতে স্নান করিতে গিয়া গুরু এক পরম সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। রমণী কোন শ্রেষ্ঠীকন্যা। সাধু সুন্দরীর অনুসরণ করিয়া তাহার পিতার নিকট গিয়া কন্যার পাণি গ্রহনের প্রস্তাব করিলেন। ধর্ম্মভীরু শ্রেষ্ঠী সাধুকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সাধুর মান রক্ষা করিলেন। কালক্রমে শ্রেষ্ঠী মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। জামাতা শ্বশুরের অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া পুত্রকন্যাসহ সুখভোগ করিতে লাগিলেন। বেচারী শিষ্যের কথা তাঁহার একটী বারও মনে উদিত হইল না। সাধু কামিনী কাঞ্চনের মোহে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেন।

গুরুর অবস্থা দেখিয়া শিষ্যের হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া গুরুর নিকট চলিলেন। অনেক মিনতি করিয়া পেটেভাতে শ্রেষ্ঠীর গৃহে ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। গোবক্ষনাথ মূর্খ সাজিয়া সদা আজ্ঞাপালন করিয়া প্রভুর প্রিয়পাত্র হইলেন। কিন্তু মা ঠাকুরাণী তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। একদিন মা ঠাকুরাণী পুত্রকন্যা দুইটীকে ভৃত্যের নিকট রাখিয়া নদীতে স্নান করিতে গেলেন। বলিয়া গেলেন, 'দেখিস্ যেন কাঁদেনা।' ভৃত্য গলা টিপিয়া সন্তান দুটাকে সান্ত্বনা করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া রহিলেন। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া শ্রেষ্ঠী-কন্যা সন্তান দুইটার অবস্থা দেখিয়া মাথার চুল ছিঁড়িয়া কান্দিয়া আকুল। রোষে, ক্ষোভে, শোকে তিনি পাগলিনী প্রায় হইলেন এবং দূর দূর করিয়া ভৃত্যকে তাড়াইয়া দিলেন। ভৃত্য বাড়ীর বাহির হইয়া গেল এবং মা ঠাকুরাণীর শোক ও ক্রোধ কিছু শান্তি হইলে অনাহূত ভাবে প্রভুর গৃহে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কাজে মন দিল। প্রভু তাঁহার পত্নীকে বুঝাইলেন, "যাহা হইবার হইয়াছে, মূর্খের উপর রাগ করিয়া কি হইবে? একপ গণ্ডমূর্খের হাতে পুত্র কন্যা সঁপিয়া দেওয়া তোমারইত ভুল হইয়াছে। এখন অনুতাপ করা বৃথা।" কিছুদিন এই ভাবে যায়, গোবক্ষনাথ ভাবিলেন, মা ঠাকুরাণীর দফা রফা না করিতে পারিলে গুরুদেবের চৈতন্য হইবে না। একদিন শ্রেষ্ঠী-কন্যা ভৃত্যকে রন্ধনের জন্য কাষ্ঠ আনিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্য সবলদেহে প্রকাণ্ড এক বোঝা কাষ্ঠ মাথায় করিয়া আনিল। প্রভুপত্নী রন্ধনে ব্যস্ত ছিলেন। ভৃত্য পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'মা ঠাকুরাণি, কোথায় রাখি?' একেত ঠাকুরাণী শিষ্যের উপর সদয় ছিলেন না, তাতে আবার কাজের সময় বারম্বার অকারণ বিরক্তি। তিনি চটিয়া বলিলেন, 'রাখ আমার মাথায়।'

ভৃত্যকে আর দ্বিতীয় বার বলিবার প্রয়োজন হইল না, আজ্ঞাকারী গোরক্ষনাথ সেই প্রকাণ্ড কাষ্ঠের বোঝা সজোরে গুরুপত্নীর মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। ঠাকুরাণী তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। গুরু গৃহে ছিলেন না, ফিরিয়া আসিয়া সহধর্ম্মিণীর অনুসন্ধান করিলেন। শিষ্য বন্ধনশালা দেখাইয়া দিল এবং গুরু জিজ্ঞাসা করিলে অকপটে সরল ভাবে সকল কথা নিবেদন করিল। গুরু অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে সমস্ত বিক্রয় করিয়া কিছু বহুমূল্য মণিমাণিক্য ও অলঙ্কারাদি সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। ভৃত্যও প্রভুর অনুগমন করিলেন। কিছু দূর যাইয়া দ্বিতীয় প্রহর বেলায় কোন নদীতীরে প্রভু ভৃত্যকে মণিমাণিক্য অলঙ্কারাদির পুঁটলী সাবধানে রাখিতে বলিয়া স্নানার্থ জলে অবগাহন করিলেন। গোরক্ষনাথ অবসর পাইয়া গহনার পুঁটলী নদীতে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। প্রভু স্নান করিয়া তীরে আসিলেন, এবং শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া শিষ্যের প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন "পাপিষ্ঠ, তুই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিস, পুত্র, কন্যা, স্ত্রী, সোণার সংসার সমস্ত ধ্বংস করিয়া এখন আমার জীবনের যাহা কিছু সম্বল অবশিষ্ট ছিল, তাহাও নাশ করিলি। কি অশুভক্ষণে তুই আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলি। আজ তোকে সংহার করিয়া, প্রাণের সকল জ্বালা নিবারণ করিব।" শিষ্য যুক্ত করে নিবেদন করিল, "প্রভো! শান্ত হউন, অর্থ যদি আপনার এতই প্রিয় হইয়া থাকে, আমি তাহা জল হইতে তুলিয়া আনিতেছি।" গুরুর রোষ দ্বিগুণিত হইল। তিনি আরো কুপিত হইয়া বলিলেন, "পাজি, আমার সঙ্গে চালাকী! গভীর নদীতে যাহা ফেলিয়া দিয়াছিস, তাহা কি আর পাওয়া যায়? আজ তোর এক দিন, কি আমার এক দিন?"

ভৃত্য বাক্যব্যয় না করিয়া নদীতে হাত ডুবাইয়া গহনার পুঁটলী যেমনটী ছিল, আনিয়া প্রভুর সম্মুখে রাখিল। প্রভু বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে ভৃত্যের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি বাপু কে?" শিষ্য বলিলেন "আমি গোরক্ষনাথ।" শিষ্য গুরুকে সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিরূপে গুরু তাঁহাকে গঞ্জিকা প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলেন, কিরূপে তিনি রমণীর রূপমোহে আত্মহারা হইয়াছিলেন, কি রূপে তিনি বিষয় ভোগে মত্ত হইয়া পরমার্থ বিস্মৃত হইয়াছিলেন, একে একে সমস্ত নিবেদন করিলেন। আর কহিলেন, "যদি আপনার এখনও ভোগলালসা ও আসক্তি শেষ না হইয়া থাকে, অনুমতি করুন, সেই শ্রেষ্ঠী-কন্যা, পুত্রকন্যা, বিত্ত বিভব সকলই আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি।" গুরুর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তিনি শিষ্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতে চাহিলেন। শিষ্য বিনীত ভাবে বলিলেন, "আপনি আমার পরম গুরু, আপনার নিকট আমি চিরঋণী, আমি আমার কর্ত্তব্য করিয়াছি মাত্র।" তদবধি গোরক্ষনাথ জনসমাজে অসাধারণ সিদ্ধপুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন।

গোরক্ষনাথের নাম জপ করিয়া যে সকল মহাত্মা সিদ্ধ হইয়াছেন, গম্ভীরনাথ স্বামী তাঁহাদের অন্যতম। ইনি নাথ-সম্প্রদায়ের কাণফোড় শাখা-ভুক্ত সাধু। স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ

গোস্বামী গম্ভীর নাথকে তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য-মণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়াছিলেন।

আমরা, গোরক্ষনাথের মন্দির প্রদক্ষিণ কালে দক্ষিণ দিকে সাধুদিগের বাসাগৃহের বারান্দায় একজন বাঙ্গালী বাবু দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া কৌতূহলপরায়ণ হইলাম। মূর্ত্তিটী যেন আমার পূর্ব্ব-পরিচিত। অর্দ্ধগৃহী, অর্দ্ধসন্ন্যাসী। আমি বাক্য ব্যয় না করিয়া অপরিচিতের নিকট গমন করিলাম। দেখিলাম, তিনি আমার সেই পরিচিত ব্যক্তিই বটেন—স্বর্গীয় গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ঢাকার উকীল বাবু বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলিলেন, যে, গম্ভীরনাথ স্বামীকে দর্শন করিতে গোরক্ষপুর আসিয়াছেন। আরো বলিলেন, সাধু বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, হিমাচলের নিম্নে সমতল ভূমিতে (plain) স্বামী গম্ভীরনাথের সমতুল্য মহাত্মা কেহ নাই। মন্দিরের মহান্তের পদ তিনি পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করিলাম। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গীয় বন্ধুরা সেখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও স্বামীজীর দর্শনের নিমিত্ত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন।

বরদা বাবু আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। মন্দিরের সম্মুখে সাধুদিগের বসিবার নিমিত্ত ছোট ছোট ঘর আছে। তাহার একটীতে একজন আড়ম্বর-শূন্য, অল্পভাষী, গম্ভীর মহাপুরুষ বসিয়াছিলেন। তিনিই গম্ভীরনাথ। তাঁহার সুস্থ, সবল, দীর্ঘ দেহ ও সুদৃঢ় মাংস পেশী সকল যৌবনে বিপুল শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছিল। তাঁহার বর্ণ গৌর, ললাট উন্নত, নাসিকা সুতীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডল দীর্ঘ শ্মশ্রু ও গুম্ফ বিমণ্ডিত। তাঁহার স্নিগ্ধ সকরুণ দৃষ্টিতে কেমন উদারতা, গাম্ভীর্য্য ও প্রসাদগুণ প্রতিভাত। সে প্রশান্ত সৌম্য-মূর্ত্তি দেখিলেই প্রাণে ভক্তির উদ্রেক হয়।

আমরা প্রণাম করিলে, দর্শন করিতে গিয়াছি শুনিয়া, গম্ভীরনাথ নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে কম্বল পাতিয়া দিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং সাগ্রহে ও সদয় ভাবে আমাদিগকে বসিতে বলিলেন। আমরা মাটীতেই বসিতেছিলাম। তিনি তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন। তিনি সাধারণ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কোথায় থাকি, কবে গোরক্ষপুরে আসিয়াছি, শরীর কেমন আছে ইত্যাদি। কিন্তু তিনি এত ধীরে ও বিলম্বে বিলম্বে কথা বলেন যে, এই আলাপ টুকুতেও দীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল। জ্ঞানবাবু দুই একটী সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া জ্ঞান ও সাধুত্ব সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। গম্ভীরনাথ নীরব। আমার নিকট তাঁহার নীরবতা যেন অতি মুখরা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি অনিমেষ নয়নে সেই সাধনাপূত মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য পান করিতে লাগিলাম। স্বামীজী একবার বলিলেন "বাবুনে যো কহা হৈ, ম্যাঁয় নেহী সমঝা।" জ্ঞানবাবু হিন্দীতে আবার বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। গম্ভীরনাথ কিছুদিন গয়ায় ফল্গুতটে আসন পাতিয়াছিলেন। আমি বলিলাম, মহারাজের কথা আমি গয়ায় ত্রৈলোক্য বাবু ও হরি বাবুর কাছে শুনিয়াছি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কার কাছে?' আমি বলিলাম, ত্রৈলোক্য বাবুর কাছে। তাঁহার নীরব মুখ-ভঙ্গীতে বোধ হইল, চিনিতে পারিলেন না। তখন বলিলাম, 'হরি বাবুসে ভী শুনাহৈ।' সাধু উত্তর করিলেন, হাঁ। হরিবাবু এক শক্স হৈঁ। আমি বলিলাম, ইদানীং তাঁহার এসকল বিষয়ের জন্য কেশ

টান হইয়াছিল। গম্ভীরনাথ ও বলিলেন 'হাঁ হুয়া থা।" সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হবি বাবু কেমন আছেন? আমি উত্তর বলিলাম, তিনি নাই, মারা গিয়াছেন। গম্ভীবনাথ আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন 'নহী হৈঁ?' আমি উত্তর করিলাম, না প্লেগে মারা গিবাছেন।'

একজন সাধু আসিয়া গম্ভীবনাথকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পদতলে, নিম্নে উপবেশন কবিলেন। গম্ভীরনাথ ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিয়া দোপাট্টার অঞ্চল হইতে গ্রন্থি খুলিয়া একটু গঞ্জিকা তাঁহাকে দিলেন। সাধু কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইযাছিল। চারিদিক ঘোর অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল। আমরা গম্ভীরনাথের চরণে মস্তক লুটাইয়া তাঁহাব আশীর্ব্বাদ লইয়া বাসায় ফিরিলাম। মহাত্মাব সংস্পর্শে আসিয়া কি এক অদ্ভুত তড়িৎপ্রবাহে প্রাণটা যেন পাহাড়ের ন্যায় উচু হইয়া মুক্ত বায়ুব ন্যায় ছুটিয়া চলিল। গম্ভীরনাথ কোন উপদেশের কথা কহিলেন না। অথচ মুহূর্ত্ত মাত্র তাঁহার চবণতলে বসিয়া হৃদয়ের সম্মুখে কি এক অপূর্ব্ব পবিত্র স্বর্গরাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেল। এ রহস্য কে উদ্ঘাটন করিবে?

শ্রীরসিকলাল রায়।

# শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট পত্র। (৪)

ভক্তিভাজন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী, এম্-এ, মহোদয় সমীপে।

ব্রাহ্মসমাজেব ইতিহাসে আপনি আরও যে সকল বিষয় উল্লেখ কবেন নাই, এবং যে গুলি একজনের প্রাপ্য অন্যকে দিয়াছেন, সেই সকলেব কতক অংশ এবার আলোচনা করিতেছি।

মিস্ কার্পেণ্টারের ন্যায় মিস্ ম্যানিং একজন একেশ্বরবাদিনী ইংরাজ মহিলা সাঁসাঁতাল ইণ্ডিয়ান সভাব প্রতিনিধিরূপে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার শ্রীবৃদ্ধি দর্শন মানসে আসিয়াছিলেন, একবাব নহে, দুইবার আসিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মসমাজেব বহুলোক-পবিবেষ্টিত হইয়া আপনি ব্রাহ্মসমাজেব পক্ষ হইতে নানা আকারে তাঁহার অর্ভ্যথনা করিয়াছিলেন। ইতিহাসে সে বিষয়ের উল্লেখ নাই কেন? আপনি ইংলণ্ডে গমন করিলে, এই বিদুষী মহিলা আপনার কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসার বৃদ্ধির জন্য ইংলণ্ডের বহু সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণীগণকে মিলিত করিয়া সেই মজলিসে আপনাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন, সে অনুষ্ঠানে তাঁহাবেব বেশ দশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই আহূত সভাতেই আপনি তদানীন্তন ষ্টেট্ সেক্রেটারি লর্ড ক্রসের সহিত পরিচিত হইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। আপনারই মুখে শুনিয়াছিলাম, লর্ড বাহাদুর আপনার সহিত আলাপে পরিতুষ্ট হইয়া আপনাকে তাঁহাব আলয়ে নিমন্ত্রণ কবিয়াছিলেন, আপনি সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন কি না, তাহা বলিতে পাবি না, কিন্তু যাঁহার বন্ধুতা ও আত্মীয়তাপূর্ণ যত্ন চেষ্টার ফলে আপনার বিলাত প্রবাসকালে আপনার কার্য্য-ক্ষেত্র কিঞ্চিৎ প্রশস্ততব হইয়াছিল, সেই গরীয়সী মহিলাব ভাবত-ভ্রমণ লিপিবদ্ধ হইল না, ইহা আক্ষেপেব বিষয়, সন্দেহ নাই।

মিষ্টাব কন্ওয়ে নামক আর একজন সম্ভ্রান্ত ইংবাজ একেশ্ববাদী ভারতের ব্রাহ্মসমাজেব কার্য্য কলাপ পরিদর্শন মানসে

আসিয়া আপনার সহিত মিলিত হইয়া এখানে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। আমিই তাঁহাকে আপনার সঙ্গে মিলিত হইয়া নানা বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে ও সমাজে আসিতে দেখিয়াছি। এইটীও উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিয়া মনে করেন নাই কেন?

সিটি স্কুল সুফল লাভ করিয়া ত্বরায় কলেজে পরিণত হইয়াছিল। এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আপনি দত্ত ও বসু মহাশয় দ্বয়ের গুণপণার উল্লেখ করিয়াছেন। পড়িলেই বোধ হয় যেন বসু মহাশয় ও দত্ত মহাশয়ই ইহার সর্ব্বাভরণ ছিলেন। ইহাই কি ঠিক কথা? আর কেহ কি ইহার উন্নতি-কল্পে প্রাণপাত করিয়া—শরীরের শোণিত বিন্দু বিন্দু দান করিয়া ইহার গৌরব ও প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করেন নাই? আমার বোধ হয়, এই সকল বৃহৎ কর্ম্মে মূলধন অপেক্ষা শ্রমস্বীকারের মর্য্যাদা অধিক, এই বিষয়ে আপনার আদৌ দৃষ্টি পড়ে নাই। শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, বাবু কালীশঙ্কর সুকুল, বাবু রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা উচিত ছিল। হেরম্ব বাবু ও রাজেন্দ্র বাবুই কলেজের মেরুদণ্ড রূপে বর্ত্তমান না থাকিলে কলেজের এরূপ শ্রীবৃদ্ধি বসু ও দত্ত মহাশয় দ্বারা কখনই সম্ভবপর হইত না। এই সংশ্রবে আর একটী বিশেষ বিষয়ে আপনার দৃষ্টিপাত না হওয়া অত্যন্ত অন্যায়। আপনি ইতিহাস লিখিতে বসিয়াছেন, সেরূপ স্থলে বর্ত্তমান সময়ে স্বদেশীয়গণের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য কলেজের মধ্যে সিটি কলেজ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। সুতরাং সিটি কলেজের সূচনার আলোচনা কালে আপনার ইতিহাস হিসাবে ইহার স্থান এবং ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী একমাত্র দেশীয় পরিচালিত মেট্রোপলিটান ও তাহার প্রতিষ্ঠাতার অধ্যবসায়, ত্যাগ-স্বীকার ও প্রাণপণ-চেষ্টার ফল এতৎসহ বিবৃত হওয়া উচিত ছিল। আপনার কি স্মরণ নাই, আনন্দ মোহন বসু মহাশয় কলেজ-বাটীর দ্বার উদ্ঘাটন কালে লর্ড রিপণ সমক্ষে কলেজের যে বিবরণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অসাধ্য সাধনের উল্লেখ ও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, আমার মনে হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সিটি কলেজ অগ্রসর হইতেছে, একথা তিনি কৃতজ্ঞতাসহ স্বীকার করিতে বিস্মৃত হন নাই। আপনি বাদ দিলেন কেন? অথচ বসু মহাশয়ের বিবরণ একদিনের বক্তৃতা মাত্র, আর আপনার বিবরণ ইতিহাস নামে বিদিত। সিটি কলেজের ত্রিতল গৃহ নির্ম্মাণ বিষয়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের আত্ম-বিসর্জ্জন লুক্কাইত, এটাও কি আপনার অবিদিত? আক্ষেপের বিষয়, একজনের প্রাপ্য অন্যকে দান, আপনার গ্রন্থের একটা বিশেষ অসাবধানতা বলিয়া আমার মনের বিশ্বাস। আর ইতিহাস হিসাবে তুলনায় যোগ্যাযোগ্যের বিচারের অভাব, এই গ্রন্থের সৌন্দর্য্য হরণ করিয়াছে। মর্য্যাদা-হীন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব মর্য্যাদা দানে দোষ নাই, ধর্ম্মই হয়, কিন্তু উপযুক্ত ও মর্য্যাদাশালী ব্যক্তির সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির সুযোগ না দেওয়া নিতান্তই অন্যায় কাজ।

আপনার সহিত আমার ব্যক্তিগত সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া আমি এইসকল বিষয়ের আলোচনা কালে নিজে নিজে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব

করিয়াছি ও এখনও করিতেছি। আমি বুঝিতে পারি যে, এগুলি আমার না করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমার আত্মনিন্দার পরিমাণ অপেক্ষা আমার আত্মপ্রসাদের পরিমাণ অধিক বলিয়া মনে করি। আমার মনে হয়, আমি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, এই সকল বিষয়ে আপনার এবং এখনকার ব্রাহ্মগণের আদৌ দৃষ্টি নাই, এবং সেরূপ দৃষ্টি রাখার আবশ্যকতা বোধও চলিয়া গিয়াছে। আর এক কথা, অনেকে অনেক কথা জানেন না। এই দেখুন না, আপনি আপনার ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮১ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী মহাশয় সম্বন্ধীয় আলোচনা ক্ষেত্রে, তাঁহার অশেষ গুণগ্রামের পরিচয় দিয়া পরে বলিতেছেন—

"But unfortunately Pandit Agnihotri soon began to develop principles of action, that daily led him further away from the lines laid down by the Brahmo Samaj, at last these new principles culminated in the establishment of the Deva Samaj"

শ্রীযুক্ত অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্বন্ধ ত্যাগের ইহাই কি কারণ? নূতন ধর্ম্মমতের পরিপোষণই কি প্রচারকের সম্বন্ধ বন্ধন ছেদনের কারণ, ইহাই আপনি ঠিক বলিয়া জানেন? আমার মনে হয়, আপনি প্রাচীন কাহিনী সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছেন। অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের সম্বন্ধে তদানীন্তন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার নিকট এক পত্র প্রেরিত হয়। সেই পত্রের বিষয় লইয়া ২।৩ মাস আলোচনার পর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মীমাংসা (যাহা ধর্ম্মমত সম্বন্ধীয় নহে) জ্ঞাপন করায় অগ্নিহোত্রী মহোদয় প্রচারক পদ পরিত্যাগ করেন। আর কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পত্রপ্রেরককে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ হইতে অগ্নিহোত্রী মহাশয় সম্বন্ধীয় আন্দোলনের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। আপনার ইচ্ছা হইলে, আপনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেই এ বিষয়ের সত্যাসত্য জানিতে পারিবেন। অবশ্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রত্যেক তিনমাসে অধ্যক্ষ সভার নিকট যে কার্য্যবিবরণ অর্পণ করেন, তাহা দেখিলে হইবে না। তাঁহারা আপন বৈঠকে বসিয়া যেরূপ অনুসন্ধান ও মীমাংসা করিয়াছিলেন, তাহা অপ্রকাশিত (confidential) বিবরণ; কেবল অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে তাঁহাদের মীমাংসার মর্ম্ম ও পত্র প্রেরককে ধন্যবাদ প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহাই তাঁহার পদত্যাগের কারণ কিন্তু কেন জানিনা, আপনি ইতিহাসে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" চাপাইয়াছেন। তাঁহার নূতন ধর্ম্মমতের পরিস্ফুটন পরবর্ত্তী কালের ঘটনা।

আপনার গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২২ পৃষ্ঠায় আপনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালকগণের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে অত্যন্ত অসাবধানতার সহিত আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "dark rumours" উপলক্ষ্য করিয়া কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার দলস্থ প্রধানেরা উৎসাহের সহিত অন্যায় পূর্ব্বক শত্রুনিপাতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন বলিয়া আপনার বিশ্বাস এবং অনুসন্ধান-পটু ও সত্যপ্রিয় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের অনুসন্ধানের উপর নির্ভর করিয়া আপনি নববিধান তন্ত্রের লোকদের আচরণ ধর্ম্ম-সঙ্গত নহে বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, আর তাঁহারা উপদেষ্টা ও আচার্য্যরূপে বেদী হইতে ঈশ্বরের নামে ইতর ভাষায় আপনাদিগকে গালাগালি দিয়াছেন বলিয়া আপনি আক্ষেপ করিয়াছেন। আপনার পাঠকেরা

আপনার এই ২২ হইতে ২৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রসারিত বিবরণ পাঠ করিয়া কি সিদ্ধান্ত করিবে, লিখিবার পূর্ব্বে তাহা কি একবার উত্তমরূপে প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছিলেন? আমার বোধ হয়, অতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করা আপনি আবশ্যক বোধ করেন নাই। আর "সতর্ক হওয়া উচিত ছিল" বলায় আপনি হয়ত বিরক্ত হইয়া বলিবেন যে "সত্য যাহা তাহাই বলিয়াছেন, যে যাহা ভাবিবার ভাবুক।" কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বেদী হইতে ভগবানের নাম লইয়া তীব্র ভাষা প্রয়োগ দ্বারা আপনাদের বিরুদ্ধে অতি কঠোর ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা সত্য, কিন্তু যে ঘটনার সহিত জড়িত করিয়া তিনি এবং তাঁহার দলস্থ প্রধানেরা এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, সেই ঘটনা সম্বন্ধে আপনার হৃদয়ের বিশ্বাসের অনুরূপ কথাই কি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন? দ্বারিক বাবু যে অনুসন্ধানপটু ও সত্যপ্রিয় লোক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি আপনাদেরই একজন, আর কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ও তাঁহার দলস্থ প্রধানেরা তখন আপনাদের বিপক্ষ। তাঁহাদের আপনাদের ও আপনাদের তাঁহাদের পতন দেখিয়া আনন্দিত হইবার সময়। এরূপ সময়ে সাধু সজ্জনেরও অনুসন্ধানে ভুল থাকিয়া যাইবার কথা। আমার বিশ্বাস ও ধারণা এই যে, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় উভয়েই মিথ্যার প্রশ্রয় দিবার লোক ছিলেন না, এরূপ স্থলে আপনার পাঠকমণ্ডলী কেশববাবুর পক্ষকে মিথ্যা ঘটনার অপরাধে অপরাধী নাও করিতে পারেন। যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে আপনার লেখার দোষে "These rumours * * were found to rest on very slender and thoroughly unreliable basis" এই কথাই বা কেন লোক বিশ্বাস করিবে? উভয় দলের বলার জোরের উপর লোকের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয় না। এইজন্য আমার মনে হয়, এই প্রসঙ্গটা আপনার ইতিহাসে আদৌ স্থান পাওয়া উচিত ছিল না। আপনি আপনাদের পরিচালক বিশেষের নাম না করিলেও, আপনার লেখার দোষে তাহা ধরা পড়ে, এইজন্য ব্যক্তিবিশেষের মর্য্যাদা হানিকর ঘটনা এরূপ ভাবে গ্রন্থে স্থান পাওয়া কোন মতে উচিত নহে। আর এক কথা, এই ঘটনা উপলক্ষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বেদী হইতে উপদেশের মধ্য দিয়া ভগবানের নামে যে সকল কটুকথা একদল ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত চরিত্রবান ও সাধু লোকদের উপর বর্ষণ করিয়াছেন, সে গুলিকে পূর্ণাবয়বে আপনার ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়া আপনি তাঁহাদের অপেক্ষা নিজেদের উপর, নিজেদের লোকমণ্ডলীর মর্য্যাদার উপর, অত্যন্ত অত্যাচার ও অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। আর উভয় সমাজের মধ্যে যে বিরোধের ভাব অল্পে অল্পে ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল, তাহাতে বল বিধান করিয়াছেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় অনন্য-সাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, সন্দেহ নাই, তিনি এবং তাঁহার পার্শ্বচরগণ এক বাক্যে তাঁহাকে যিশু তুল্য ব্যক্তি বা তাঁহার কনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইলেও, তাহা কখনও হইবেনা। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ-ব্যাপারই আপনা হইতে সে পথে অর্গল দিয়াছে, তিনি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তাঁহার কন্যার বিবাহে আদর্শচ্যুত না হইলে, নিশ্চয়ই তিনি এই মর্ত্ত্যলোকে নরদেবতার আসন লাভ করিতেন। নরদেবতার উচ্চ লক্ষণ সকল তাঁহাতে বর্ত্তমান ছিল। আমি ইহা অনুভব করি। এরূপ ব্যক্তি বিনা কারণে

বা অযথেষ্ট প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ তীব্র অবমাননাসূচক বাক্য ভদ্রমণ্ডলীর উপর প্রয়োগ করিয়াছিলেন,এরূপ চিন্তা যেমন হৃদয়-বিদারক, অপর দিকে আপনাদের পরিচালক দলের কোন একজন এরূপ তিরস্কারের পাত্র, ইহা স্মরণ করিতেও হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেছি। আবার ইহা অপেক্ষা অনেক অধিকতর ক্লেশের কারণ এই যে, আচার্য্যরূপে কেশবচন্দ্র সেই জনমণ্ডলীকে অকথ্য তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগের অনেকেই তাঁহার অনুরাগী বন্ধু ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আপনার ঐ আলোচনায় তিন দিক দিয়া অনিষ্ট হইয়াছে। কেশবচন্দ্রকে নবদেবতার পদে বসাইলে যিশু-মুখনিঃসৃত তীব্র ভাষার ন্যায় ঐ গুলি আমাদের অঙ্গাভরণ হইয়া যায়। তিনি, ঐ তিরস্কার বাক্যগুলি, (আপনার প্রদত্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে) ব্যক্তিবিশেষকে অপরাধী বলিয়া মনে করিয়া, অসংখ্য চরিত্রবান সাধু ব্যক্তিদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও তাঁহার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান ও সঙ্গে সঙ্গে সমকক্ষ বন্ধুমণ্ডলীর মর্য্যাদা-জ্ঞান বিলোপের পরিচয় স্থল। ব্যক্তি বিশেষের সম্বন্ধে ঐ ঘটনা সত্য হইলে, তাঁহার প্রতি আপনাদের আচার আচরণ সুসঙ্গত হয় নাই। তাহা হইলে এই প্রতিপন্ন হয় যে, আপনারা বন্ধুর খাতিরে উচ্চ আদর্শ ত্যাগ করিতে পারেন। এই অপ্রীতিকর ও অসঙ্গত আলোচনায় আপনি হস্তক্ষেপ না করিলেই পারিতেন, আর তাহা হইলেই ভাল হইত।

এখন আমি আপনাকে এই বিষয়ে একটী মাত্র প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব। আয়র্লণ্ডের স্বায়ত্ব শাসনাকাঙ্ক্ষী দলের দলপতি পার্ণেলের পতনে দলটী কেন বিনষ্ট হয় নাই? পার্ণেলকে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া না? কিন্তু সেখানে উভয় দলই সন্দেহের ক্রোড় আশ্রয় করে নাই। তাহারা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া সত্য নির্দ্ধারণে সক্ষম হইয়াছিল, তাই মুক্তিলাভ সম্ভব হইয়াছিল। এখানে সেরূপ কোন চেষ্টা কি আপনারা করিয়াছিলেন? এখানে প্রতি পক্ষকে মিথ্যা রটনায় বাধা দিবার কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? সে বিষয়ে ত কোন আলোচনা করেন নাই। উচ্চ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে আপনারাই হউন বা কেশবচন্দ্র সেন ও তদীয় সঙ্গীদলই হউন—অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সাহসী হন, তাহা হইলে, আমাদের সমাজের বাঁচিবার আশা কোথায় স্থাপন করিলেন? মোট কথা এই যে,যে পক্ষেই অসত্য লুকাইয়া থাকুক না কেন, আপনার আলোচনার ফলে একপক্ষ যে মিথ্যার প্রশ্রয়দাতা,সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সন্দেহের অনুকুল ও প্রতিকুল আলোচনা ইতিহাসে স্থান পায় না। ইতিহাসে প্রতিপন্ন সত্যেরই আলোচনা হইয়া থাকে, সে আলোচনায় ভুল থাকিতে পারে, কিন্তু জ্ঞাতসারে নহে। আর সুযোগ ঘটিলে ইতিহাস লেখক সে ভ্রমশংসোধন করিয়া থাকেন। আপনি কি সেরূপ ভাবে সত্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক ঐ আলোচনাকে আপনার পুস্তকে স্থান দিয়াছেন? আপনার বর্ণনা পাঠে তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হয় না। ঐ বিবরণ এরূপ অসাবধান ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠককে একটা ধোকার মধ্যে নিক্ষেপ করা কোন মতেই বিবেচনার কার্য্য হয় নাই।

আপনার ইতিহাসের ২য় খণ্ডের ২৪১ পৃষ্ঠা কেশবচন্দ্রের বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি বহু সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, আপনি

এই কথা বলিয়া, পর পৃষ্ঠায় মাদক-নিবারণ বিষয়ে তাঁহার আগ্রহপূর্ণ যত্ন চেষ্টার উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে প্যারিচরণ সরকার মহাশয়ের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু সরকার মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার চেষ্টার ফল নির্দ্দেশ বিষয়ে কেবল "early sixties" বলিয়া শেষ করিয়াছেন। কেশবচন্দ্রও যে প্যারি বাবুর কার্য্যে সহকারিতা করিয়াছিলেন, তাহাও বলিয়াছেন, কিন্তু বলেন নাই, একটী প্রধান কথা। "The Indian Temperance Record" নামক পত্রিকায় দেখিলাম, ১৮৬৪খ্রীঃ শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মাদক-নিবারণ-সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া সুরাসেবনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কেবল সভা প্রতিষ্ঠা, বক্তৃতা ও মাদক সেবনের অপকারিতা বিষয়ে সহজবোধ্য প্রবন্ধ রচনা করিয়া বিতরণ করায় তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি সুরাসেবিগণের মজ্‌লিসে মজ্‌লিসে গিয়া তাহাদের প্রতি আত্মীয়তা ও স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সুরাসেবনে বিরত করিতে চেষ্টা করিয়া অনেক স্থানেই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এবং এরূপ ভাবে তাঁহার কর্ত্তৃক সুরাসেবনে বিরত অনেক শ্রমজীবী ও ভদ্র সন্তানদিগকে আমরা সৈকালে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এই সম্বন্ধে "Record" বলিয়াছেন "During the first year of the society's existence upwards of twenty men were rescued from intemperance and vice, gradually most of the known drunkards gave up their habits and many of them joined a Reading Club formed by Mr Banerji on the very site where there was formerly a drinking Club." আশ্চর্য্য এই যে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের গুরুত্ব এবং সে সকলের উত্তম ফলের বিবরণ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাস-লেখকের বিশেষ কাজ। আপনি কলিকাতার প্যারিবাবুর অনুষ্ঠান বা বরাহনগরে শশিপদবাবুর অনুষ্ঠান সম্বন্ধে কোন কথাই ইতিহাস হিসাবে আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিলেন না, মাঝখান হইতে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে মাদক নিবারণের পক্ষপাতী ও সভা সমিতির প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বেশ একটু জমকাল করিয়া তুলিয়াছেন। আপনাকে আবার বলিতেছি, এই মাদক-সেবন নিবারণ বিষয়ে যদি কোনও ব্যক্তি বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন, তবে শশিপদ বাবু সে জন্য কৃতজ্ঞতার পাত্র। এখানে দুটী ঘটনার উল্লেখ করা আবশ্যক। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আবাল্য নিরামিশাসী ও মাদক সেবন-বিরোধী, তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সুরাপানের স্রোত খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সে সময়ের শিষ্যমণ্ডলী মধ্যে মদের ব্যবসায়ী ব্রাহ্ম ছিলেন, তিনি তাঁহাদের ব্যবসায় পরিত্যাগ করাইতে পারেন নাই, তাঁহাদের সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রিকার প্রাচীন ফাইল অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন, মদের বিজ্ঞাপন বাহির হইত। এই হিসাবে দেখিতে গেলে শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর যত্ন চেষ্টার ফল ও সেই ফলের মূল্য যে অনেক অধিক, সে বিষয়ে আপনি কি কোন সন্দেহ করেন? আর এক কথা এই যে, তিনি সে কালে যে নৌকাতে নিত্য নিত্য কলিকাতা হইতে বরাহনগর যাতায়াত করিতেন, একদিন সেই নৌকাতে বরাহ-

নগরের মদের দোকানের কর্ম্মচারী মদের চালান লইয়া উঠিয়াছিল। তিনি লোকটাকে লইতে আপত্তি করিলেন না, কিন্তু মদের সঙ্গে একত্র যাইতে অসম্মত হওয়াতে, স্থানীয় শুঁড়ীভায়ার অর্থবলে তাঁহাকে ঐ কর্ম্মচারীর প্রাণনাশের অজুহাতে একদিন শ্রীঘর বাস করিতে হইয়াছিল। তৎপর লুক্কায়িত কর্ম্মচারী বাহির হইয়া পড়ায় হাজত বাস হইতে অব্যহতি লাভ করেন। মাদক সেবন নিবারণ করে "in the early sixties" এইরূপ নির্য্যাতন ভোগও কি আপনার ইতিহাসের বিষয়ীভূত হইবার যোগ্য হইল না? কেন এরূপ হইল, আপনি এই সমস্ত বিবরণ হাতে পাইয়া ইতিহাসের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি বিষয়ে উদাসীন হইলেন কেন? আপনার এরূপ উপযুক্ত উপকরণ পরিত্যাগ করার কারণ বুঝা গেল না।

একটী মানুষ নিষ্ঠাসহকারে চেষ্টা করিলে, কত দিকে কত প্রকার উত্তম কার্য্যের সূচনায় ও সম্পাদনে সক্ষম, শশিপদবাবু সে সকলের জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এরূপ ব্যক্তির সমগ্র জীবনব্যাপী বহুবিধ কার্য্য আপনার ব্রহ্মপুত্রার ঢাকীদের বাদ্যভাণ্ডের পশ্চাতে লুক্কায়িত থাকিবে, ইহা নিতান্তই আক্ষেপের বিষয়, সন্দেহ নাই। যাঁহারা উত্তম বস্তু অবজ্ঞা সহকারে দূরে নিক্ষেপ করিয়া অধম বস্তুর সমাদরে ব্যস্ত, বিধাতার বিধানে তাহারা যে দণ্ডের যোগ্য, আমার মনে হয়, আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দের সেই অপরাধে সেই দণ্ড ভোগ করিতেছি। এগুলি অপরাধ, আর এই গুলি এক হিসাবে গুরুতর অপরাধ। এই অপরাধ ভারেই আজ সমাজ অবসন্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। আর সেই জন্যই এইরূপ ইতিহাস লেখাটী আমাদের সমাজের লোকের নিকট মানাইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাহিরের অভিজ্ঞ লোক ইহাতে ভুলিবে না। আক্ষেপের বিষয় এই, আরও অনেক কথা বলিবার ছিল ও আছে, কিন্তু বুঝিয়াছি, মৃতপ্রায় জনমণ্ডলীর নিকট এই সকল কথার কোনও মূল্য নাই। সত্যাসত্যের অনুসন্ধান ও যোগ্যাযোগ্যের বিচার কেবল জীবিত নরনারীমণ্ডলীই করিয়া থাকেন।

প্রণত শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
বিরা।

# নিবেদন।

(১)

কয়েক বৎসর হইতে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনের সহিত একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন হইতেছে। কিন্তু ক্ষুদ্র একটী দলের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে এই সম্মিলন হইতে কোন মহৎ ফল উৎপন্ন হইতেছে না ও হইবে কিনা, সন্দেহের বিষয় হইয়াছে। ইহার ইংরাজি নাম দেওয়া হইয়াছে "All India Theistic Conference" ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন। ভগবান এ নাম সার্থক করুন। কিন্তু ইহার কার্য্যপ্রণালী দ্বারা এনামের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইতেছে কি? ভারতীয় একেশ্বরবাদী বলিতে তো কেবলমাত্র ব্রাহ্মসমাজকে বুঝায় না! ভারতে কি আর একেশ্বরবাদী নাই? ভারতীয় জনমণ্ডলীর একার্দ্ধ মুসলমান-একেশ্বরবাদী, বাবা নানক কবীর প্রভৃতি

একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়সমূহ ভারতবর্ষের নানাস্থানে একেশ্বরের পূজা করিতেছেন। আর্য্যসমাজ একেশ্বরবাদীর সমাজ। এতদ্ব্যতীত হিন্দুসমাজকে ত্যাগ করেন নাই, এমন কত শিক্ষিত ব্যক্তি ভারত ব্যাপিয়া এক ঈশ্বরের পূজায় রত আছেন। "ভারতীয় একেশ্বরবাদীর সম্মিলন" ক্ষেত্রে ইঁহাদের স্থান নাই কেন? ইঁহাদিগের ন্যায্য স্থান শূন্য রাখিয়া সম্মিলন কি সঙ্গত ও সম্পূর্ণ হইতে পারে? কেন ইঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া লওয়া হইতেছে না? আর কত দিন ইঁহারা আপন অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? যে ক্ষেত্রে বিশাল ভারতবর্ষের অসংখ্য একেশ্বর-পূজক অবাধে আসিয়া মুক্তহৃদয়ে মিলিত হইবেন, তাহাকে ক্ষুদ্র প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করিবার দুঃসাহসিক চেষ্টা কেন হইয়াছে? একেশ্বরবাদীর মিলন-ক্ষেত্র করিতে হইলে ভগবানের নামে সকল একেশ্বরবাদীকেই ডাকিতে হইবে। জাতীয় মহা-সমিতির ক্ষেত্রে এইরূপ একটী মহামিলনের আয়োজন হইলে ভারতে এক মহাজাতি গঠনের সহায়তা হইবে না কি? সকল একেশ্বরবাদীর মিলনের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র আছে। ভগবানের নামে যে মিলন হয়, শুধু রাজনৈতিক মিলন অপেক্ষা তাহা শতগুণে দৃঢ়তর এবং মঙ্গলতর। All India Theistic Conferenceএর উদ্যোগকর্ত্তৃগণের নিকটে নিবেদন যে, ইহাকে কেবলমাত্র ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা অরে যেন না হয়। ইহাতে বঞ্চনা করা হইতেছে—বঞ্চিত হওয়া হইতেছে। সম্মিলন-সভার দ্বার দিকে দিকে উন্মুক্ত হউক। একজন মাত্র একেশ্বরবাদীও যেন এই দ্বারে প্রবেশ করিতে বাধাপ্রাপ্ত না হন। এই অবাধ মিলন-ক্ষেত্রে ভারতীয় সকল একেশ্বরবাদী সম্মিলিত হইয়া একহৃদয়ে ভারতের মঙ্গল প্রার্থনা করুন এবং সকল ভারতবাসী কিরূপে একেশ্বরের উপাসক হইতে পারেন, সে বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করুন। তাহার জন্য সমবেত সকলের আবেদনপত্র প্রেরিত হউক রাজার দরবারে, যিনি সকলের একছত্র সম্রাট। ইহা কত বড় কাজ!!

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিবার চেষ্টার এক্ষেত্রেও কি প্রয়োজন আছে, জানিনা। সাম্প্রদায়িক সম্মিলনের জন্য তো মাঘোৎসব রহিয়াছে। বৎসরান্তে ব্রাহ্মসমাজের সকলের একবার একত্র মিলনের আবশ্যকতা সেই সময় পূর্ণ হইতে পারে। এক্ষেত্রে সেরূপ মিলনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া বোধ হয় না। এখানে বৃহত্তর, প্রশস্ততর মিলন হইলে এ সম্মিলন সত্য ও সার্থক হইতে পারে। নহিলে ইহার নাম মিথ্যা হইয়া যায়।

এমন এক সময় ছিল, যখন ব্রাহ্মদের সুনির্দ্দিষ্ট প্রাচীর প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই সময়ে সেই গণ্ডিগঠনের ঝোঁকে ব্রাহ্মগণ উৎসাহের সহিত বলিয়াছিলেন,—"আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই, খ্রীষ্টান নই, বৌদ্ধ নই, জৈন নই। . . ""আমরা তোমাদের নই নই" বলিয়া সকল জগতের সহিত ভিন্নতার পাষাণ-প্রাচীর চতুর্দ্দিকে জাগাইয়া তোলা হইয়াছে। এখন এ বিচ্ছেদের বদ্ধ বেদনা আমাদিগকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে। আমরা নিজের মুখে বলি—আমরা কাহারও নই, সুতরাং কাহারও হৃদয়েই আর আমাদের স্থান পাওয়া যাইতেছে না। যে ধর্ম্ম এত বড় উদার,—বিশ্বগ্রাসী, বিশ্বপ্লাবী, বর্জ্জনের মন্ত্র যে ধর্ম্ম-বিধানের কোথাও নাই, তাহার বার্ত্তাবহগণ এমনি করিয়া আপনাদিগকে সন্তর্পণে সকলের সংস্পর্শ হইতে

সরাইয়া রাখিবেন? মুক্ত বিশ্বের মধ্যে আপনাদিগকে ব্যাপ্ত করাইয়া দিয়া বলিবেন না "আমি তোমাদের—আমি সকলের"?

ভারতীয় একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন এই মিলনের মন্ত্র প্রচার করুন। আমরা চারিদিকে বিষণ্ণ বিচ্ছেদ বাধাইয়া বসিয়াছি। এই সম্মিলনকে এখন মিলনের শুভ সূত্ররূপে ব্যবহার করিয়া সকলের সহিত যোগস্থাপনের চেষ্টা করা হউক।

(২)

আর একটী নিবেদন আছে। শিশু কালের পক্ষে যাহা উপযোগী ও আবশ্যক, পরিণত বয়সের পক্ষে তাহাই উপযোগী নহে, ক্ষতিকর হইতে পারে। মাতৃবক্ষ, মাতৃকক্ষই শিশুর পক্ষে যথেষ্ট, পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে এই সীমা স্বাস্থ্যকর নহে। ১৮৭২ সালের ৩ আইন অনুসারে ব্রাহ্মদের বিবাহ রেজষ্টরী ব্যাপারকে সমাজের এইরূপ একটী শৈশব-কালোচিত বিধান বলিয়া মনে হইতেছে।

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন এবং তাঁহার অগ্রসর-দলের চেষ্টায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট এই আইন পাশ করেন। সেই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজের অগ্রসর শাখাদ্বয় ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার অনুযাত্রিগণ এই আইন নিতান্ত অনাবশ্যক বোধে ইহার প্রতিবাদ করেন। আদি-সমাজের ব্রাহ্মগণ মহর্ষিদেবের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তাঁহারা ৩ আইনের শরণাপন্ন হন নাই।

৩ আইনের সমর্থনকারিগণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে যে সকল অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ হইতেছিল, আইনের চক্ষে বাতিল (invalid) হইতে পারে। তৎকালীন ন্যায়াধ্যক্ষ (Advocate General) মহাশয়ও এরূপ আশঙ্কার যথেষ্ট কারণ আছে, এইরূপ মত প্রদান করিয়াছিলেন। প্রধানতঃ সেই জন্যই আচার্য্য কেশবচন্দ্র গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু আরও কয়েকটী কারণ ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই আইন দ্বারা বাল্য বিবাহ রহিত হইবে এবং বহু বিবাহ অর্থাৎ এক স্ত্রী বা স্বামীর বর্ত্তমানে দ্বিতীয় স্ত্রী বা স্বামী-গ্রহণ দণ্ডনীয় সুতরাং বর্জ্জনীয় হইবে। এই সকল গুরুতর বিষয় চিন্তা করিয়া সংস্কারকগণ এরূপ একটী আইনের অত্যাবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন।

কিন্তু ক্রমশঃ অনেক ব্রাহ্ম (অগ্রসর এবং অত্যগ্রসর দলস্থও) এই আইনের কোন কোন ধারাকে অসমীচীন মনে করিয়া ইহার পরিবর্ত্তন আবশ্যক মনে করিতেছেন। এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে এবং সংশোধন চেষ্টারও ত্রুটি হয় নাই। এই আইনদ্বারা সর্ব্বপ্রধান অনিষ্ট যাহা হইয়াছে, তাহা সংশোধনের উপায় নাই। আইনের বিধান অনুসারে বিবাহার্থী ও বিবাহিনীকে বলিতে হয়,—"আমি হিন্দু নই, মুসলমান নই, খ্রীষ্টান নই, ইহুদি নই, জৈন নই, পার্শি নই, ইত্যাদি।" অর্থাৎ ব্রাহ্ম প্রচলিত কোন মতের, কোন সম্প্রদায়ের কেহ নহেন, একথা ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। তবে আমরা কি?—জিজ্ঞাসা করি—আমরা কি? এ প্রশ্নের যে সাধারণ উত্তর পাওয়া যাইবে, তাহা সন্তোষজনক নহে। এইরূপ স্বীকৃতি দ্বারা অকল্যাণ উৎপন্ন হইয়াছে। বিশ্বমানবের সকলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া ব্রাহ্ম এক স্বতন্ত্র দল হইয়া পড়িয়া-

ছেন। চারিদিকের সকলে যেন সন্দেহের সহিত এই অস্বীকার-কারিদিগের দিকে দৃষ্টি-পাত করিতেছেন। আমরা যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে কিছু বুঝিয়া থাকি, তবে তাহা এই যে, এই ধর্ম্ম মানুষকে এক করিতে আসিয়াছেন, বিশ্ব-মানবকে আপনার বলিয়া স্বীকার ও গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন। ব্রাহ্মগুরুগণের উপ-দেশেও তাহাই শিখিয়াছি। সকল দেশের ও সকল কালের বিধান-প্রবর্ত্তকগণকে এবং সকল শাস্ত্রের সনাতন সত্যকে ব্রাহ্মগণ ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মদের শাস্ত্র, ব্রাহ্মগুরুগণের উপদেশ, ব্রাহ্ম সাধকদিগের আচরণ বলিতেছে,—"সকলে আমাদের আপন" ও আইন বলিতেছে—"আমরা কাহারও নই"। ইহা নিতান্তই অসঙ্গত ঠেকিতেছে। বস্তুতঃ "আমরা হিন্দু নই, মুসলমান নই" ইত্যাদি কথা সত্যের বিরোধী। আমরা "হিন্দু, মুসলমান সকলের, সকলে আমাদের,"—এই কথাই সত্য, ইহাই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ব্রাহ্মেরা ক্রমশঃ একটী ক্ষুদ্র দলের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। এই দলের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতা ও হীনতা স্পষ্ট ও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সকলকে অস্বীকার করিতে গিয়া ইঁহারা সকলের দ্বারা অস্বীকৃত হইয়াছেন এবং আপনার দেশে বিদেশী ও আপন জাতির মধ্যে বিজাতীয় হইয়া পড়িতেছেন। ইহার নৈতিক ফল গুরুতর। দেশীয় খ্রীষ্টান ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ইঁহারা যেন মাতৃক্রোড়চ্যুত সন্তানের ন্যায় দেশের নিতান্ত উপেক্ষিত ক্ষুদ্র দল। ব্রাহ্মগণও কেন এ বিকৃতি মাথা পাতিয়া লইতেছেন?

আইনদ্বারা মানুষকে সুনীতিসম্পন্ন করিতে পারা যায়, একথা কি অকাট্য সত্য? ও আইন অনুসারে বিবাহ করিয়াও ত কেহ কেহ স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন—আইন তো তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই! বলিতে ক্লেশ হয়, স্বয়ং মহাত্মা কেশবচন্দ্র আইন পাশের পাঁচ বৎসর পরে আপন আইন অনুসারে অপ্রাপ্ত বয়স্কা কন্যাকে পাত্রস্থা করিয়াছিলেন—আইন ত তাঁহার বিবেককে বাঁধা দিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় আইনের সহায়তা সত্ত্বেও বিধবাবিবাহ হিন্দু সমাজে চালাইতে পারিয়াছেন কৈ? পক্ষান্তরে ব্রাহ্মসমাজকে বিধবাবিবাহ প্রচলন করিতে তো কোন আইন করিতে হয় নাই! আইন দ্বারা সমাজসংস্কার বা আত্ম-সংস্কার হয়—একথা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে এই বিকৃতিকে আকড়িয়া থাকিবার আবশ্যকতা কি?

অসবর্ণ বা বিধবা বিবাহ আইনের চক্ষে অসিদ্ধ হইতে পারে—এইটীই সে কালের প্রধান যুক্তি ছিল। এখন ৪০ বৎসর পরে সাহস করিয়া বলা যায়, এ আশঙ্কার আর কোন কারণ নাই। দেশময় এই ব্রাহ্ম পরিবার, ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সমাজের অনেকে জ্ঞানে, চরিত্রে, কৃতিত্বে, পদে, গৌরবে দেশের শীর্ষস্থানে সমাসীন। এখন যদি ব্রাহ্মগণ এই আইনকে বর্জ্জন করিয়া আপনাদের মত ও বিশ্বাস অনুসারে আপনাদের বিবাহানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন, গভর্ণমেণ্ট তাহা আইনানুমোদিত বলিয়া স্বীকার করিতেই বাধ্য হইবেন। নিতান্ত ক্ষুদ্র ও নিম্নশ্রেণীর বিবাহ-প্রণালীকে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিতে বাধ্য ও তাহা করিয়া থাকেন। এখন যদি সমগ্র ব্রাহ্মসমাজ এক হইয়া এ কলঙ্ক মোচন করিতে বদ্ধপরিকর হন, ভয়ের কোন কারণ দেখি না।

হিন্দুবিবাহ বলিলে আমরা কি বুঝি? হিন্দুশাস্ত্রে ত নানা প্রকারের বিবাহের বিধান আছে। সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন পদ্ধতি অবাধে চলিয়াছে। তবে বিশুদ্ধ ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ বাতিল হইবে কেন? ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মসমাজ কি সর্ব্বপ্রধান নহে? তবে ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মানুশাসিত ও সমাজানুমোদিত বিবাহকে, অর্থাৎ বিবাহেব ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানকে যথেষ্ট স্বীকার কবিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবিবেন না কেন?

আইন সংশোধন কবা সহজ নয়, সম্ভব কিনা, জানিনা। গত বৎসব মাননীয় ভূপেন্দ্র-নাথ বসু মহাশয়েব বিপুল চেষ্টা বিফল হইয়াছে। বাজরারে সংশোধনেব আশা আর শীঘ্র দেখা যাইতেছে না। একমাত্র উপায় ব্রাহ্মদেব নিজেদের হাতে আছে, তাহা ও আইনকে বর্জ্জিত কবিয়া বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পাদন কবা। রাজবিধিদ্বারা পবিত্র দাম্পত্যবন্ধনকে দৃঢ়ীকৃত করিবাব কল্পনা আমাদের দেশে কোন কালে ছিল না। তবুও শুনিতে পাই ও বিশ্বাস করি যে, হিন্দু জাতির দাম্পত্য সম্বন্ধের ধারণা যেমন উচ্চ ও পবিত্র, এমন আর কোন জাতির মধ্যে ছিলনা, নাই, হইবে কি না, জানিনা। পক্ষান্তরে দেখিতেছি, বিবাহকে আইন দ্বারা সুদৃঢ় করিবার রীতি যে সকল জাতির মধ্যে প্রচলিত, সেখানে অল্প কারণে, বা অকাবণে বিবাহ ভঙ্গ হইতেছে, আবার বিবাহ হইতেছে, আবার ভাঙ্গিতেছে। সুতরাং অন্ততঃ এ বিষয়ে আমরা দেশীয় প্রথাকে অতিক্রম না করিলেও পারিতাম। মনে হইতেছে, এমন এক সময় ছিল, যখন ব্রাহ্মেরা দেশীয় অনেক ভাল বস্তুকেও সহসা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশবাসীর প্রাণে অকাবণ আঘাত করিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। বরং আপনাদিগকে প্রতিবেশীর নিকটে বিরক্তিকব করিয়া তুলিবার দিকে একটা ঝোঁক ছিল। হয়তো সংস্কারের প্রথম অবস্থায় এরূপ আচবণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এখানে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিতে চাহিনা।

আমরা মনে কবি, এ একটা ভুল হইয়া গিয়াছে। অথবা সমাজের শৈশবকালে একটা আইনের আবশ্যকতা ছিল। এখন তাহা নাই, এখন ভুল সংশোধন করা কর্ত্তব্য।

আরও এক কারণে এই আইন অসম্পূর্ণ। সে ইহাব দায় ভাগ সম্বন্ধীয় ধারাটী। আইন সম্বন্ধে তর্কযুক্তি করিবার স্পর্দ্ধা রাখিনা, সুতবাং সে সম্বন্ধে নীবব থাকাই ভাল। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকের ধারণা এই যে, ইহার দায়ভাগ সম্বন্ধীয় ধারাগুলি দোষশূন্য নহে।

ভাবতীয় একেশ্বরবাদিগণের সম্মিলন নিকটবর্ত্তী। আশা করি, সমবেত ব্রাহ্ম-নায়ক এবং ব্রাহ্মগুরুগণ এই সম্মিলনে এ বিষয়টী আলোচনা করিয়া দেখিবেন এবং যুক্তিযুক্ত বোধ হইলে একটু নৈতিক সাহসের পথ অবলম্বন করিবেন।

শ্রীনির্ঝরিণী ঘোষ।

# দেব-দূত।*

"দেব-দূত একখানি অপূর্ব্ব দার্শনিক দৃশ্য কাব্য। ইহার পাঁচটী দৃশ্যে আদর্শ হিন্দু-পরিবারের অনুপম স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য, মানব-চরিত্রের বিচিত্র লীলা এবং প্রবৃত্তির সহিত কর্ত্তব্যের তীব্র সংগ্রাম অসাধারণ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। অরবিন্দ যৌবন-সুলভ রূপজ মোহের বশবর্ত্তী হইয়া উদ্দাম প্রবৃত্তির প্রবল তাড়নায়, নিরাশ প্রেমের মমতা-বর্ত্তরূপ মোহ গর্ত্তে নিপতিত হইতে চলিয়াছিল; নিজ সহধর্ম্মিণী, পতিপ্রাণা মাধবীর আত্মোৎসর্গের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য তাহাকে স্পর্শ করিবার অবসর পায় নাই। আবাল্য সুহৃৎ, সুপণ্ডিত, বিচক্ষণ অজয় ভগবানের কৃপায় অন্ধের যষ্টিস্বরূপ হইয়া তাহাকে এই মোহ-তামিস্র হইতে রক্ষা করে। নিঃস্বার্থ হৃদয়, শোকাগ্নি-দগ্ধ-বাসনা, শান্তিময়ী ভগিনী অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিময়ী জগন্মাতা অন্নপূর্ণাস্বরূপিণী। ভগবানের বিচিত্র বিধানে, কর্ত্তব্যের কঠোর শাসনে নিষ্পেষিত হইয়া অরবিন্দের মোহ-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিল। উদ্দাম বাসনার প্রতিকূলে স্রোত বহিল। অরবিন্দ যৌবনের প্রথম উন্মেষে রূপের মোহে গাহিয়াছিল. "I slept and dreamt that Life was beauty—"

"প্রাণময়ি, জীবনের অমৃত আমার,
সান্ত্বনা মানেনা মন যবে আমি নেহারি তোমার
অতুল সৌন্দর্য্য-প্রভা কল্পনা নয়নে।"

এখন কর্ত্তব্যের কঠোর তাড়নায় গাহিল, "I woke and found that Life was Duty"

"সম্মুখে হের হে—সংসারের
কর্ম্ম-ক্ষেত্র হ'ল প্রসারিত।
ইচ্ছানিচ্ছা করিয়া দলিত
মনোমাঝে, হইবে সাধিতে
কর্ত্তব্য আপন। হ'বে দিতে
আপন অস্তিত্ব বিসর্জ্জন।"

* * *

এযে—সবি
অদৃষ্টের নিগূঢ় বিধান।
আমি কি করিব? ভাসমান,
তুচ্ছ তৃণ খণ্ড যদি চাহে
নির্ঝরের প্রখর প্রবাহে
প্রতিকূল-গামী হ'তে,—সে কি
পারে কভু তাহা?"

কবি মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণে অসাধারণ নিপুণতা দেখাইয়াছেন।

পণ্ডিত অজয় অরবিন্দের উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে কর্ত্তব্য-জ্ঞান উন্মেষ করাইয়া নির্ম্মল শান্তি প্রদান করিবার জন্য ও দীনা পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী মাধবীর প্রতি সৌহার্দ্দ জন্মাইবার জন্য অরবিন্দকে সম্বৎসরব্যাপী দেশ-ভ্রমণে নিযুক্ত করিলেন। প্রথমে, পুণ্যধাম বারাণসীর পবিত্র ক্ষেত্রে দেবাদিদেব বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে ভক্ত-কণ্ঠোত্থিত স্তব-সঙ্গীত সহ বিশ্বেশ্বরের আরতির সময়ে সাধকমণ্ডলীর ভক্তির উচ্ছ্বাসের প্রবল তরঙ্গে অরবিন্দের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাব জাগরিত হইল। অরবিন্দ প্রতিমা পূজার বিরোধী ছিলেন, এবং তীর্থ-মাহাত্ম্য

* মূল্য ।৷০ মাত্র। ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, গুরুদাসবাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

স্বীকার করিতেন না। কিন্তু, সাধকগণের প্রবল ভক্তিতরঙ্গের আক্ষেপ তাহাকে উদ্বুদ্ধ করিল। আবর্ত্তির মঙ্গলধ্বনি শ্রবণে, অজয় বলিতেছে—

"কি মহান এই দৃশ্য। এ পঙ্কিল প্রাণ
ধন্য হয় না কি মিত্র, পুণ্যতম এ দৃশ্য
হেরিলে?

অর— (নীরব)

অজ— বন্ধু,—

অর— (নীরব)

অজ— ভ্রাতঃ, কি ভাবিছ?

অর— সত্য বলেছিলে
তুমি—কাশী পীঠ-স্থান।

অজ— (সবিস্ময়ে) অরু!
শোন—শোন মোর কথা,
মোর এ বিশুষ্ক প্রাণে আজি ব্যাকুলতা,
আসিয়াছে।

অজ— আর যদি কিছু নাহি হয়,
তবু—তবু বুঝিতেছি আজি সুনিশ্চয়—
ভকতের উচ্ছ্বসিত, ভক্তিপূর্ণ ইচ্ছাশক্তি-
বলে
প্রমূর্ত্ত হয়েছে এই দেবালয় তলে—
সেই পুণ্যক্ষেত্রে তাঁ'র অনুভূতি প্রত্যক্ষ
মহান।
তাই, শুষ্ক, পাপী আমি,—আমারো পরাণ
উঠিতেছে শিহরিয়া। সহস্র বৎসর ভক্তগণ
হেন ভাবে যথা করে তাঁর আরাধন,
সত্য বলিয়াছ বন্ধু, জ্ঞানী তুমি,—ভগবান
নিত্য প্রতিষ্ঠিত, ধ্রুব তাহা তীর্থস্থান।

পরে অমর-কবি বাল্মীকির চির শান্তিময় নির্ঝরের বারিসিঞ্চনে অরবিন্দের মরু-হৃদয়ে বিশুদ্ধ সহধর্ম্মিণী-প্রেম সঞ্জীবিত করিবার মানসে অজয় তাহাকে অযোধ্যায় লইয়া গেল। এই কল্পনায় কবির মানব-হৃদয়ের অভিজ্ঞতা ও চিত্র-নৈপুণ্যের অসাধারণ শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।

অজয়ের রাম-গুণ-গান অরবিন্দের নিকট অসঙ্গত বোধ হইল। অজয় রাম-চরিত্র সমর্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যুক্তি-জালের খণ্ডন করিতে গিয়া অরবিন্দ সীতার প্রতি রামচন্দ্রের অসঙ্গত ব্যবহার ও সীতার চরিত্রের মহত্ত্ব-বিশ্লেষণে তৎপর হইলেন; এবং তাহাতে আত্মদৃষ্টি উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজ সহধর্ম্মিণী পতিপ্রাণা মাধবীর প্রতি নিজের নির্দ্দয় ব্যবহার ও মাধবীর নিঃস্বার্থ প্রেমের স্বর্গীয় মাহাত্ম্য যুগপৎ তাঁহার হৃদয়ে প্রতিভাত হইত।

"মরিবে—সে যে একান্তই ভালবাসিয়াছে
আমারে পরাণ ঢালি'। আর কেবা আছে—
এ সংসার মাঝে তার? আহা সে যে
বড় অসহায়।
সে ব্যথিতা কহ, আর কিছু তো না চায়,
চাহে শুদ্ধ মোর কৃপা, বিন্দুমাত্র প্রেম।
তবে,—তবে,
এমনি কি চির দিন সে দুঃখিনী র'বে,
উপেক্ষায় চির-নিগৃহীতা।"

ইতিমধ্যে মাধবীর সংবাদ আসিল,—

"পুত্র তাঁর জন্মিয়াছে অতীব সুন্দর,
কিন্তু,একান্ত পীড়িতা তিনি,অতীব কাতর।"

অরবিন্দের চিত্ত এখন দোদুল্যমান, তবুও নৈনিতালে চলিলেন।

নৈনিতালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় কবির অসাধারণ প্রতিভা প্রকটিত হইয়াছে। অরবিন্দ নৈনিতাল গিয়া প্রকৃতির সহিত তাঁহার "বিরাট ঐক্যের সূত্র, নাড়ীর বন্ধন," উপলব্ধি করিলেন। অজয়ের নিষ্কাম,নিঃস্বার্থ সৌহার্দ্দও নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার দিকে দৃষ্টি পড়িল।

অর— আজন্ম কুমারব্রত করিয়া গ্রহণ,